দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

মানহায আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ..... ৫

(জান্নাত লাভের উপায়-০৬)..... ৫

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তে কি লাভ আছে... ..... ১০

(জান্নাত লাভের উপায়-০৭)..... ১০

আমি কি শুধু যিকির-তিলাওয়াতেই সন্তুষ্ট? তাহলে আমি কতটুকু দ্বীনদার?.....১৪

কিসাসঃ এক হৃদয় প্রশান্তকারী বিধান..... ১৮

বর্তমান (তথাকথিত) মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন.....২২

সংশয় নিরসন; ই'দাদ কি শুধু রাষ্ট্রেরই দ্বায়িত্ব.....৪১

কেন আমি আল কায়দায় অংশগ্রহণ করলাম.....৪৯

(প্রথম পর্ব, ভূমিকা ও কারণ ১).....৪৯

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম..... ৫৮

(দ্বিতীয় পর্ব, কারণ ২ ও ৩)..... ৫৮

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম.....৬২

(৩য় পর্ব- কারণ ৪ ও ৫).....৬২

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম..... ৬৮

(৪র্থ পর্ব, কারণ-৬)..... ৬৮

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম.....৭৪

(৫ম পর্ব, কবরণ-৭, ৮, ৯).....৭৪

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম..... ৮৪

(৬ষ্ঠ পর্ব, কারণ ১০ ও ১১)..... ৮৪

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম..... ৯০

(৭ম পর্ব, কারণ ১২)..... ৯০

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম ৯৬
(৮ম পর্ব, কারণ ১৩-১৫) ৯৬
একটু প্রস্তুতি ১১৪
দ্য আর্ট অব জিহাদ (আর্ট অব ওয়ার অবলম্বনে) ১৩২
১ম পর্বঃ যুদ্ধ পরিকল্পনা ১৩২
দ্য আর্ট অব জিহাদ (আর্ট অব ওয়ার অবলম্বনে) ১৪৪
২য় পর্বঃ যুদ্ধ পরিকল্পনা ১৪৪
উম্মাহর মুজাহিদিনদের ঘোষণা এটা উম্মাহর জিহাদ ১৫১
সংশয়ঃ ইলম শিক্ষাকালীন অন্য কোন ফিকির করা কি ক্ষতিকর? ১৫৪

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ

(জান্নাত লাভের উপায়-০৬)

imam ibnu taimiah

Junior Member

০১-০১-২০১৯

আলহামদুলিল্লাহ বিগত পর্বগুলোতে আমরা কালেমাতুত তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সুস্পষ্ট অর্থ জেনেছি। আজকে আমরা জানবো-

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ কি কি?

তবে তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কালেমার এই শর্তগুলি কেন আদায় করতে হবে??

একবার হাসান বসরীহ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, কিছু লোক বলে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জবাবে হাসান বসরীহ (রহঃ) বললেন, "হা (এ হাদীস ঠিকাছে তবে এর ব্যাখ্যা হল) যে ব্যক্তি এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর হকসমূহ ও ফরজসমূহকে আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে"।

আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর হক হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহকে আদায় করা।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, একদা প্রসিদ্ধ তাবেঈ ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, "অবশ্যই (এটি জান্নাতের চাবি)। প্রত্যেকটি চাবিরই দাত থাকে, সুতরাং তুমি যদি দাতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস তোমার তালা খুলবে। অন্যথায় তালা খুলবে না। আর জান্নাতের চাবির দাত হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ"।

অর্থাৎ দাত ছাড়া চাবি দিয়ে যেমন তালা খুলবে না, ঠিক তেমনি কেউ যদি কালেমাতুত তাওহীদের শর্তসমূহ আদায় না করে জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।

এজন্যেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ আদায় করতে হবে। যদি কেউ এর শর্তসমূহ আদায় করে তাহলে তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নামক চাবিটি দিয়ে জান্নাতের দরজা খুলবে। অন্যথায় খুলবে না।

কালেমাতুত তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তসমূহ :

উলামায়ে কেরাম কালেমাতুত তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লল্লাহ এর শর্তগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

এক. পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা লাভের জন্য কালেমার শর্তসমূহ,

দুই. আখিরাতে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বাচার জন্য কালেমার শর্তসমূহ।

এক. পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা লাভের জন্য ২ টি শর্ত :

ক) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করা, এর স্বীকৃতি প্রদান করা এবং এর স্বাক্ষ্য দেওয়া :

ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন লোকদের বিরুদ্ধে ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা এ কথার স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল এবং নামাজ আদায় করে ও যাকাত আদায় করে। সুতরাং যখন তারা এগুলো পালন করবে তারা আমাদের থেকে তাদের জান-মাল হেফাজত করে নিবে। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে। আর তাদের হিসাব আল্লাহর হাতে। (সহীহ বুখারী)।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইন পাঠ করবে না, সে মুসমানের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। সে উম্মাহর সালফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং অধিকাংশ আলেমদের মতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কাফের। (মাজমু উল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ৭৮৭/৬০৯)।

খ) নাওয়াকিযুত তাওহীদ/ঈমান অর্থাৎ তাওহীদ/ঈমান বিনষ্টকারী কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া,

কালেমাতুত তাওহীদের স্বাক্ষ্য দেওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি থেকে ঈমান বিধ্বংসী কোন কিছু প্রকাশ পায় তাহলে তার জান ও মাল নিরাপত্তা লাভ করবে না।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে (অর্থাৎ যার থেকে ঈমান বিধ্বংসী কোন কিছু) প্রকাশ পায় তাকে হত্যা কর। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় শর্ত হল কালেমাতুত তাওহীদের স্বাক্ষ্য দেওয়ার পর তার থেকে নাওয়াকিযুত তাওহীদ প্রকাশ না পাওয়া। যদি তার থেকে তাওহীদ ও ঈমান বিনষ্টকারী কোন কিছু প্রকাশ পায়, তাহলে তার জান ও মাল নিরাপত্তা লাভ করবে না।

দুই. আখিরাতে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বাচার জন্য কালেমাতুত তাওহীদের শর্ত ৭টি :

১) আল ইলম (জ্ঞান) : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানা,বুঝা। এর জ্ঞান অর্জন করা।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

জেনে রাখ! যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (মুহাম্মদ ১৯)।

উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা জানা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৬)।

২) আল ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) : কোন ধরণের সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত এই কালেমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

নিশ্চই সত্যিকার (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান আনে। অত:পর কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি..। (হুজরাত ১৫)।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সংশয় ছাড়া এই কালেমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৭)।

৩) আল কবুল (গ্রহণ) : এই কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকে অন্তর থেকে গ্রহণ করা এবং সকল গায়রুল্লাহকে অন্তর থেকে বর্জন করা। এটা হল আমালুল ক্বলব। অন্তরের কর্ম। তাই যে এক আল্লাহর ইবাদাতকে কবুল করবে না সে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

যখন তাদেরকে বলা হত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া) তখন তারা অহংকার করতো আর বলতো আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে বর্জন করবো? (সফফাত ৩৫-৩৬)।

৪) আল ইনক্বিয়াত (আত্মসমর্পন) : এই কালেমার মাধ্যমে কালেমাতুত তাওহীদের (মিথ্যা ইলাহগুলিকে বর্জন করে এক সত্য ইলাহ আল্লাহর একত্ববাদের) সামনে বাহ্যিক অংগ প্রত্যংগের দ্বারা আত্মসমর্পণ করা। এটা হল আমালুল জাওয়ারেহ। অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করলো, সে যেন মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরলো। (লুকমান ২২)।

৫) আস সিদক (সত্যবাদিতা) : অন্তরের মাধ্যমে একে সত্যায়ন করা,সত্য বলে বিশ্বাস করা। সত্য দিলে, সত্য মন নিয়ে, অন্তর থেকে সত্যায়ন করে এই কালেমাতুত তাওহীদের স্বাক্ষ্য দেওয়া।

আল্লাহ বলেন,

যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন তারা বলে আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চই আপনি আল্লাহর রসূল। নি:সন্দেহে আল্লাহ তো জানেনই যে আপনি তার রসূল। তবে আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদি। (মুনাফিকুন : ১)।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সত্য দিলে একথার স্বাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। (সহীহ বুখারী ১ম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১২৮)।

৬) আল ইখলাস (আন্তরিকভাবে) : একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই কালেমা পাঠ করা, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

আল্লাহ বলেন,

আল্লাহকে ডাক তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (মুমিন : ১৪)।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা আলা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নিয়েছে। (বুখারী,মুসলিম)।

৭) আল মুহাব্বাত (ভালবাসা) : এই কালেমার মর্ম ও এই কালেমা অবলম্বনকারীদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

আর মানুষের মধ্যে (এমন লোকও) আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে তার সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহর মত করে ভালবাসে। আর যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে...। (সূরা বাকারাহ ২ : ১৬৫)।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি গুণ এমন রয়েছে যে কোন ব্যক্তির মাঝে যদি গুণগুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে অবশ্যই সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। (গুণগুলো হল- তার নিকট আল্লাহ ও তার রসূল সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং সে কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা, অপছন্দ করবে যেমনটা সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারি,মুসলিম)।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৩০

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তে কি লাভ আছে...

(জান্নাত লাভের উপায়-০৭)

[imam ibnu taimiah]

Junior Member

০১-০২-২০১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু ইলম অর্জন করার তৌফিক দান করেছেন।

আজকে আমরা জানবো এই কালেমাতুত তাওহীদের হক আদায় করলে তা আমাদেরকে কি বিনিময় দেবে।

গত পর্বে কালেমাতুত তাওহীদের শর্তাবলী আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এর বেশ কিছু ফযীলত জেনেছি। তবে আজকে আমরা কালেমাতুত তাওহীদের বিস্তারিত ফযীলত নিয়ে আলোচনা করবো। যাতে করে আমাদের অন্তরে এর প্রতি আরো বেশী আগ্রহ পয়দা হয়।

১) সফলতা ও বিজয় অর্জন : মক্কার মুশরিকদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রকাশ্যে সাফা পাহাড়ের উপর থেকে দ্বীনের দ্বাওয়াহ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন "যদি তোমরা একটি কথা (একটি কালেমা) মানতে পার, তাহলে তোমরা সমগ্র আরবের মালিক হয়ে যাবে। আর আনারব বিশ্ব তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে। অথবা যারা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে না তারা তোমাদেরকে জিযিয়া (কর) দিয়ে থাকবে।

সবার মনে একই প্রশ্ন কি সেই কথা যেটা মানলে গোটা আরব আমাদের হাতে চলে আসবে, অনারব বিশ্ব আমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে অথবা জিযিয়া দিয়ে থাকবে। সেই মহামূল্যবান কথাটা কি? সকলেই তখন পাগলের মত উৎসুক হয়ে সেই কথা (কালেমা) মানার জন্য একমত হয়ে গেল।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলে উঠলেন, "ওহে লোক সকল তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তাহলেই তোমরা সফল (বিজয়ী) হতে পারবে। তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করো, আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা যা কিছুর ইবাদাত কর সে সমস্ত কিছুকে বর্জন কর"।

২) আল ক্বওলুছ ছাবিত (শ্বাশ্বত/সুদৃঢ় বাণী) :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

يثبّت الله الذين أمنوا بلقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضلّ الله الظّالمين ويفعل الله ما شاء

"যারা ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহ সুদৃঢ় রাখবেন 'ক্বওলুছ ছাবিত' (শ্বাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী) র মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের মাধ্যমে এবং জালিমদের গোমরাহীতে রাখবেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম"। (ইব্রাহীম: ২৭)

ইমাম বাগভী (রহঃ) বলেন, **هي قول لا إله إلا الله**অর্থাৎ আল ক্বওলুছ ছাবিত (শ্বাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী) হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

৩) কালিমাতুত তাক্বওয়া :

فأنزل الله سكينته وألزمهم كلمت التقوى وكانو أحقّ بها وأهلها وكان الله بكلّ شيء عليما

অত:পর আল্লাহ তার রসূলের উপর ও মুমিনের উপর স্বীয় প্রশান্তি (সাকীনাহ) নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য কালিমাতুত তাক্বওয়া (তাকওয়ার বাণী) অপরিহার্য করে দিলেন। আর তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও যোগ্য উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (ফাতহ : ২৬)।

আল্লামা ইমাম শাওকানী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **وهي لا إله إلا الله كذا قال الجمهور**কালিমাতুত তাওহীদ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (ফাতহুল ক্বাদীর ৫ম খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)।

৪) জান্নাতে প্রবেশ :

عن عثمان قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دخل الجنّه

উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা জানা অবস্থায় মারা যাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩৮)।

عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم من كان أخر كلامه لا إله إلله دخل الجنّه

মুয়ায ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যার সর্বশেষ বাণী হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। আবু দাউদ হাদীস নং ২৭০৯, মুস্তাদরক লিল হাকীম ১ম খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী একে সমর্থন করেছেন)।

৫) গুনাহ মাফের কারণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল :

عن أبى ذر قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفض الحسنات

আবু যর গিফারী (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যখনই তুমি কোন বদ আমল করবে, তখনই একটি নেক আমল করো। তাহলে তা তোমার বদ আমলকে মুছে দিবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি নেক আমলের অন্তর্ভূক্ত?

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২১৪৮৭)।

৬) সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির :

عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول أفضل أذّكر لا إله إلا ألله و أفضل الدعاءالحمد لله

জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ আলহামদুলিল্লাহ। (তিরমিযী হাদীস নং ৩৩০৫, ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৭৯১, ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৭৪৬)।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

চলবে.... ইনশা আল্লাহ....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৪৪

আমি কি শুধু যিকির-তিলাওয়াতেই সন্তুষ্ট? তাহলে আমি কতটুকু দ্বীনদার?

Mimbarut Tawhid

Member

০৩-০৬-২০১৯

যদি আমি দ্বীনের কষ্টসাধ্য কাজগুলো- যেমন, জিহাদ, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ইত্যাদি- পরিত্যাগ করে যিকির-তিলাওয়াতজাতীয় নরম নরম ইবাদাতে লিপ্ত থাকি, তা সত্ত্বেও সমাজে বিশিষ্ট দ্বীনদার পরিগণিত হয়ে যাই, তাহলে যেন আমি ধোঁকায় না পরি। আসলে আমি কতটুকু দ্বীনদার- একটু যাচাই করা দরকার। এ সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.)-এর মহা মূল্যবান এ বাণীটি আমার স্মরণ রাখা উচিৎ। তিনি বলেন,

وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا؛ فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجها ذكرها شيخنا - رحمه الله - في بعض تصانيفه؛ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله - ﷺ - وبما كان عليه هو وأصحابه رأي أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان، وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله - ﷺ - يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ ، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه

غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب؛ فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل.

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا «أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. «

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد «أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا» ؟. اهـ اعلام الموقعين 2\120-121

“ইবলিস অধিকাংশ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে যে- নির্দিষ্ট কিছু যিকির, তিলাওয়াত, নামায, রোযা, যুহদ ও দুনিয়াত্যাগের মতো আমলসমূকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে। আর তারা (আমর বিল মা’রূফ, নাহি আনিল মুনকার, জিহাদ ও দ্বীনের পথের কষ্টসাধ্য) এসব আমল পরিত্যাগ করেছে। বাস্তবে নবীগণের প্রকৃত উত্তরসুরিদের দৃষ্টিতে এরাই সবচেয়ে কম দ্বীনদার শ্রেণীর লোক। কেননা দ্বীন তো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর আদেশ পালন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আবশ্যকীয় হকগুলো আদায় করে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা আদেশ পালন না করা ত্রিশ দিক দিয়ে নাফরমানী করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আমাদের শায়েখ (ইবনে তাইমিয়া) রহ. তার এক কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যে দ্বীন পালন করে গেছেন, সে সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা দেখতে পান, দ্বীনদ্বার বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকাংশই (এখন) সবচেয়ে কম দ্বীনদ্বার শ্রেণীর লোক। আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বস্তুগুলো পদদলিত হতে দেখেও, আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখেও, আল্লাহর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখেও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা দেখেও যার অন্তর প্রশান্ত, যবান নিশ্চুপ- তার মধ্যে আবার কিসের দ্বীনদ্বারি? কিসের কল্যাণ? সে তো বোবা শায়তান, যেমন বাতিল বলনেওয়ালা সবাক শয়তান। দ্বীনের ধ্বংস তো এদের কারণেই হচ্ছে; উদরপূর্তির ব্যবস্থা আর গদি ঠিক থাকলে দ্বীনের কি হল না হল সে নিয়ে যাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের মধ্যে যাদের দ্বীনদারি সবচেয়ে ভালো, তাদের অবস্থা হল: একটু চিন্তিত হয় আর হালকা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি এদের সম্মান ও সম্পদে কোন আঘাত লাগে, তাহলে রেগে আগুন হয়ে যায়। সর্বসামর্থ্য দিয়ে নাহি আনিল মুনকারের (???) তিনো স্তর (হাত, যবান ও অন্তর) প্রয়োগ করে।

এরা যে শুধু আল্লাহর (রহমতের) দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছন তা-ই নয়, বরং নিজেদের অজান্তেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসিবতের শিকার হয়েছে। আর তাহলো- অন্তরের মৃত্যু। কেননা অন্তর যতটা প্রাণবন্ত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য তার ক্রোধ তত বেশি হয়; দ্বীনের জন্য তত বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়।

ইমাম আহমদ রহ. সহ আরো অনেকে একটি আছার উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন, অমুক অমুক জনপদ ধ্বসিয়ে দাও। ফেরেশতা আরজ করল, হে রব! কিভাবে ধ্বংস করবো, সেখানে তো অমুক ইবাদতগুজার বান্দা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দেন, তাকে দিয়েই শুরু করো। (অন্যায় কাজ দেখেও) আমার জন্য কোন এক দিনও তার চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখা দেয়নি।

আবু উমার (ইবনে আব্দুল বার) রহ. 'তামহিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লাহ তায়ালা এক নবীর নিকট ওহী পাঠান, তুমি অমুক যাহেদকে বলো, দুনিয়াবিমুখতার

দ্বারা তুমি দুনিয়াতে অগ্রিম প্রশান্তি বেছে নিয়েছো। আমার ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার দ্বারা তুমি সম্মান লাভ করেছো। কিন্তু তোমার উপর আমার যে হক রয়েছে, তার জন্য তুমি কি করেছো? যাহেদ আরজ করল, হে রব! আমার উপর আপনার কোন্ হক পাওনা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দিলেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন বন্ধুকে তুমি মহব্বত করেছো? কিংবা আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা করেছো?"- **ই'লামুল মুওয়াককিঈন ২/১২০-১২১**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬২৬

কিসাসঃ এক হৃদয় প্রশান্তকারী বিধান

Mujaheed of Hind

Senior Member

০৩-১৮-২০১৯

বিসমিল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ'র, চিরদিনের জন্য (সুবহানাহু ওয়াতাআলা)। যে আল্লাহ আমাদের কল্যাণার্থে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এবং দান করেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব যা বিধানসমূহ বর্ণনা করে। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রহমতের নাবী, মালাহীমের নাবী'র উপর (সল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম)। শান্তি বর্ষিত হোক নাবী পরিবার ও সাহাবীদের উপর (রদিয়াল্লহু আনহুম)। এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবে।

আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি হত্যার ক্ষেত্রে প্রতিশোধের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির উপরে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আর দাসের উপরে দাসের ক্ষেত্রে, আর নারীর উপরে নারীর ক্ষেত্রে। তবে যাকে কিছুটা রেহাই দেয়া হয় তার ভাইয়ের তরফ হতে, তাহলে বিচার হবে ন্যায্যভাবে, আর তার প্রতি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে উদারভাবে। এটি তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে লঘু-ব্যবস্থা ও করুণা। কাজেই এরপরে যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে ব্যথাদায়ক শাস্তি"

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"আর তোমাদের জন্য প্রতিশোধের বিধানে রয়েছে জীবন, হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ! যাতে তোমরা ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করো" **সূরা বাক্বারাঃ আয়াত (১৭৮-১৭৯)**

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'হে ঈমানদারগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায়পন্থা অবলম্বন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এই ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে না। যেমন সীমা লঙ্ঘন করেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলো।

ইমাম আবু হাতিমের (রঃ) বর্ণনায় এই আয়াতের শান-ই-নুযূল এই পর্যন্ত করা হয়েছে যে, আরবের দুটি গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পরস্পর প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার হয় এবং বলেঃ 'আমাদের দাসের পরিবর্তে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষকে হত্যা করা হোক। তাদের এই দাবী খন্ডনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই হুকুমটিও মানসূখ।

কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ النّفس بالنّس অর্থাৎ **"প্রাণের বদলে প্রাণ"**। সুতরাং, প্রত্যেক হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। স্বাধীন দাসকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত, পুরুষ নারীকে হত্যা করুক বা এর বিপরীত। সর্বাবস্থায় এই বিধানই চালু থাকবে। সুতরাং, স্বাধীন লোক সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া হবে।

যেকেউ প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ রুপে তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া জখম বা কোন অঙ্গ হানির ক্ষেত্রেও একই বিধান।

জিজ্ঞাস্যঃ চার ইমাম এবং জমহূর বিদ্বানগণের মাযহাব এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। উমার (রাঃ) এর যুগে সাতজন মিলে একজন লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করে দেন এবং বলেন-

যদি 'সুনআ' গোত্রের সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তবে আমি প্রতিশোধ রুপে তদের সকলকেই হত্যা করতাম। কোন সাহাবীই তাঁর যুগে এই

ঘোষণার উল্টো করেননি। সুতরাং, এই কথার উপর ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্রঃ তাফসীর ইবনু কাসীর, তাফসীর মাআরেফুল কুরআন

ভ্রান্তি নিরসনঃ

১. জয়নিস্ট ইহুদীদের মৌন সম্মতিতে ফিলিস্তীনে যদি একজন মুসলিমও মারা যেয়ে থাকে তাহলে তাদের রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে গেছে ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের পরেই যখন ফিলিস্তীনের মুসলিমরা ইজরায়েল চক্রান্তে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতারিত হয়েছিলো।

২. যদি বার্মার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মদদে একজন মুসলিমও মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে এই ন্যাড়া বৌদ্ধজাতিকে উড়িয়ে দেয়ার বিধান জারি হয়ে গেছে আজ থেকে কয়েক যুগ আগেই।

৩. কাশ্মীর বা ভারতে যদি একজন মুসলিমও হিন্দুদের বর্বরতার শিকার হয়ে থাকে তাহলে হিন্দ প্রদেশ মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে গেছে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের জামানাতেই।

৪. কুফ্ফার রাষ্ট্রগুলোর বেসামরিক জনগনের রক্তও মুমিনদের জন্য হালাল হয়ে গেছে যখন কিনা তারা ভোট দিয়ে এমন শাসক নির্বাচন করে যে শাসক তার সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা মুসলিম জনপদগুলো রক্তে রঞ্জিত করে, যখন কিনা তাদের দেয়া ট্যাক্সের টাকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে তথাকথিত **"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ যুদ্ধ"** নামক প্রহসনে ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার পায়তারা চলছে।

আজ তথাকথিত যে আলেম, যে মুসলিম, যে দাওয়াতের মেহেনতকারী ভাই নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জুমার মুসুল্লিদের উপর দখলদার ক্রুসেডারদের উত্তরসূরী'র দ্বারা সংগঠিত ঠান্ডা মাথার ঘৃণিত হত্যাযজ্ঞের পরও লেখনীকে জিহাদের সাথে তুলনা করে, বক্তৃতাকে জিহাদের সাথে তুলনা করে, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ/ ক্বীতাল ফী সাবিলিল্লাহ- এর বিরুদ্ধে কথা বলে, ফরদুল আঈন জিহাদের ফরযিয়াত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে, মুজাহিদীনদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে নিজের মুসলমানিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, তারা কি ভূলে গেছেন কিসাসের বিধান ? যা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে !

আপনারা অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা আমরাও করি। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ মুমিনদের হাতেই বাতিলের বাক রুদ্ধ করে দেবেন, মুমিনদের দ্বারাই উম্মাহ'র অন্তরকে প্রশান্ত করবেন ইনশাআল্লাহ। এটাই আল্লাহ'র ওয়াদা। আর ওয়াদা পালনে আল্লাহ'র চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই।

সর্বশেষ ও সর্বোত্তম কথা হচ্ছে, "প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই" ওয়ামা আ'লাইনা ইল্লাল বালাগ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৭৩৪

বর্তমান (তথাকথিত) মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসি (হাঃ)

[পর্ব ১]

Abu Zor Gifari

Senior Member

০৩-৩১-২০১৯

বাংলায় অনূদিত বইয়ের সূচীপত্রঃ

★ আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা একটি কুফরি কাজ

★ প্রথম সংশয়ঃ শাসকদের বিধান রচনার কুফর বড় কুফর না ছোট কুফর?

-**কুফরির প্রথম কারণঃ** কালিমার প্রথম দাবী, 'তাগুতকে বর্জন' না করার কারনে তারা কাফির।

-**কুফরির দ্বিতীয় কারণঃ** আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কারণে তারা কাফির।

-**কুফরির তৃতীয় কারণঃ** তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখার কারণে এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার কারণে কাফির।

-**কুফরির চতুর্থ কারণঃ** আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করার কারণে তারা কাফির।

-**কুফরির পঞ্চম কারণঃ** তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করার কারণে কাফির।

-**কুফরির ষষ্ঠ কারণঃ** আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করার কারণে তারা কাফির।

-ইবনে আব্বাস রাদিঃ এর মতের সঠিক ব্যাখ্যা

★ দ্বিতীয় সংশয়ঃ তারা তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে।

★ তৃতীয় সংশয়ঃ তারা তো সালাত কায়েম করে সিয়াম পালন করে।

★ চতুর্থ সংশয়ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তাকফির করে সে কুফরি করে।

★ পঞ্চম সংশয়ঃ তারা তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ।

★ ষষ্ঠ সংশয়ঃ তারা তো বাধ্য, দরিদ্র ও অসহায়।

★ সপ্তম সংশয়ঃ তাদেরকে তাকফির করে কি লাভ?

★ শেষ কথা

★ আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা

★ আমাদের সর্বশেষ পয়গাম

বিস্তারিতঃ

★ আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করা একটি কুফরি কাজ

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা একটি কুফরি কাজ। কিন্তু এই কুফর বড় কুফর না ছোট কুফর তা নিয়ে কিছু জ্ঞানপাপী দরবারি আলিম সংশয় সৃষ্টি করছে। এই সংশয়গুলোর সঠিক জবাব না জানার কারণে সাধারন মুসলিমরা তো

বিভ্রান্ত হচ্ছেই এমনকি অনেক দা'য়ী ভাইদেরকেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এই সংশয়গুলো ও তার জবাব নিম্নে এক এক করে তুলে ধরা হল।

★ **প্রথম সংশয়ঃ** শাসকদের বিধান রচনার কুফর বড় কুফর [১] না ছোট কুফর [২]?

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা হচ্ছে একটি বড় কুফর। আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী কিছু লোক আছেন, যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নকারী তথাকথিত মুসলিম শাসকদের পক্ষাবলম্বন করে বলে থাকেন, "তোমরা যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মুসলিম শাসকগণ ও তাদের সাহায্যকারী সাংবাদিকদল, তাদের রক্ষাকারী সৈন্যদল ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারী অন্যান্যদের কাফির বলে ঘোষণা দাও, সে মূলনীতিতে আমরা তোমাদের সাথে একমত নই। কেননা এই শাসকদের কুফুরি আমাদের মতে ছোট কুফর, বড় কুফর (যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়) নয়। আর তাদের দাবী হচ্ছে, এ মতের প্রবক্তা ছিলেন কুরআনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী ইবনে আব্বাস রাদিঃ।

আমাদের জবাবঃ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মানুষের মতানৈক্য থাকে। তবে তার একটি সীমারেখা আছে। যদি তা হয় শাখাগত বিষয়ে তবে তা মেনে নেয়া যায়। (উদাহরণস্বরূপ ৫ ওয়াক্ত সালাত যে ফরজ এটি একটি মূল বিষয়। এতে মতভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু সালাতের মধ্যে 'রফউল 'ইয়াদাইন করা অথবা না করা এ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে কারণ এটি শাখাগত বিষয়)। আলেমগণ বলেন, শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই এ মতানৈক্য সৃষ্টি হয় কোন একটি হাদিস সাহিহ বা জায়িফ বলে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকার কারণে। অথবা কোন হাদিস ফাক্বিহ পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে বা এ ধরনের অন্য কোন সমস্যা থাকার কারণে। আর যদি এ মতভেদ হয় দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে, তবে তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তারপরও কেউ মতানৈক্য তুলতে পারে; তবে তার অর্থ এই নয় যে, সত্যের সন্ধান না করেই অন্ধ ভাবে কোন এক মতের অনুসরণ করতে হবে। সত্য তো একটিই, একাধিক হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

‘সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে?’ [সুরা ইউনুস- ৩২]

অপর স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা বলেন,

‘এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তারা এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।’ [সুরা নিসা- ৮২]

সুতরাং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য, বিশেষ করে তাওহীদ, রিসালাত, শিরক, ঈমান ও কুফরের মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কোন ব্যক্তির জন্য এটি কোন ভাবেই বৈধ হবে না যে, এধরনের মতানৈক্যকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে, এটিকে(মতানৈক্যকে) মুরতাদ ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন বা তাদের থেকে সাহায্য গ্রহনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে! আর এ কাজটি যদি হয় সন্তুষ্টচিত্তে তবে তা হবে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবৈধ। বরং অত্যাবশ্যক হল যে সকল মাস’য়ালার উপর ঈমানের মূল ভিত্তি রয়েছে সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান মতানৈক্যের সমাধান করা এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা বলেন,

‘তবে কি তোমরা মনে করে ছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এমনিতেই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?’ [সুরা মু’মিনুন- ১১৫]

আর তিনি কোন বিষয় কোরআন মাজীদের আলোচনা ব্যাতিরেকে ছেড়ে দেননি।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা বলেছেন,

‘আমি কিতাবে কোন ত্রুটি রাখিনি’ [সূরা আন’আম- ৩৮]

সুতরাং সকল কল্যানকর বিষয়ে আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সকল মন্দ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন।

বর্তমানে শাসকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা তাদের কাফির হওয়া সুস্পষ্ট। আর কুফর হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের একটি অন্যাতম দিক। যে ব্যাক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও তাওহীদকে বুঝেছে তার নিকট এ সকল আল্লাহদ্রোহী শাসকদের

কুফরের বিষয়টি দিবালোকের চেয়েও সুস্পষ্ট। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যে ব্যাক্তির চোখে পর্দা রয়েছে দ্বি-প্রহরের সূর্যও তার দৃষ্টিগোচর হবে না। ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা চেষ্টা করবো তাওহীদের পথ্য দ্বারা চোখের পর্দাকে সরিয়ে দিতে ও ঐশী আলো দ্বারা সকল আঁধার দূর করতে। প্রথমত আমাদের জানা উচিত ঐ সমস্ত আল্লাহদ্রোহী শাসকদেরকে শুধুমাত্র একটি নীতির উপর ভিত্তি করে কাফের বলা হচ্ছে না। ফলে তাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর বানী "কুফর দূনা কুফর" 'এই কুফর সেই পর্যায়ের কুফর নয়' এর অপব্যাখ্যা দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং তাদের এই কুফরী অনেকগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার প্রত্যেকটি তাদেরকে স্পষ্ট কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ঐ সকল কারনসমূহ হতে শুধুমাত্র ছয়টি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

-**কুফরীর প্রথম কারণঃ** কালিমার প্রথম দাবী, 'তাগুতকে [৩] বর্জন' না করার কারনে তারা কাফির।

তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের মূলভিত্তি হলো দুটি। যার একটি অপরটি ব্যতীত কোন কাজে আসে না। বরং তাওহীদের কালেমাকে মেনে নেওয়া এবং তার সত্যায়নের জন্য উভয়টি একই সাথে থাকা আবশ্যক। তার একটি হচ্ছে সকল বাতিল ইলাহ তথা গাইরুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান (লা ইলাহা) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ তথা সত্যায়ন (ইল্লাল্লাহ) যেমনটি আল্লাহ (সুবহানাহু তাআলা) বলেছেনঃ

قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۖ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'...অতঃপর যে ব্যাক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরলো'। [সূরা বাক্বারা-২৫৬]

উক্ত আয়াতে **كُفۡرۡ بِٱلطَّٰغُوت** 'তাগুতকে অস্বীকার' থেকে প্রথম ভিত্তি (লা ইলাহা) এবং **وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّه** 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' থেকে দ্বিতীয় ভিত্তি (ইল্লাল্লাহ) এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো। অতএব যে ব্যাক্তির মাঝে এ দুটি ভিত্তির সমন্বয় ঘটলো না, সে শক্ত হাতলকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরলো না। ফলে সে হবে

মুওয়াহহিদের(আল্লাহর একক্ত্বে বিশ্বাসীদের) কাতার বহির্ভূত এক ব্যাক্তি। আমরা যদি তাদের (দরবারী আলেমদের) দাবী মেনে নেই যে, এ সমস্ত শাসকবর্গ (যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে বিধানদাতা হিসেবে অংশীদার সাব্যস্ত করে এমনকি কখনো কখনো তারা নিজেরাও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধী বিধান রচনা করে তাগুতে পরিণত হয়) যদিও তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি আল ঈমানু বিল্লাহ (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) আনয়ন করেছে তাও তারা আল্লাহর একক্ত্বে বিশ্বাসীদের কাতারে শামিল হতে পারবে না। কেননা অপর একটি আবশ্যকীয় ভিত্তি এখনো বাকি রয়ে গেছে তা হলো 'আল কুফরু বিত তাগুত' (তাগুতকে অস্বীকার)। আর আল্লাহ (সুবঃ) 'আল ঈমানু বিল্লাহ' (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) এ রুকনের পূর্বে তা উল্লেখ করেছেন। 'আল কুফরু বিত তাগুত' (তাগুতকে অস্বীকার) করা ব্যতীত 'আল ঈমানু বিল্লাহ' (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) তৎকালীন মক্কার কাফের কুরাইশদের ঈমানের মতই। কেননা মক্কার কাফের কুরাইশরা আল্লাহর (সুবঃ) প্রতি বিশ্বাস রাখতো কিন্তু তাগুতকে বর্জন করতো না। (তারা আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিলো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি তারা মূর্তিরও ইবাদাত করতো। মোটকথা তারা একমাত্র ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেয়নি। তারা আল্লাহর বিধানসমূহকে নিজেদের জন্য গ্রহন করেনি। মোট কথা তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য/ইতাআত করেনি।) আর এটি জানা কথা, এই ঈমান মক্কার কাফের কুরাইশদের কোন কাজে আসেনি। তাদের জান-মালকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এর সাথে শর্ত যুক্ত ছিলো 'তাগুতকে অস্বীকার করা' , তাগুতের সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করা। এর পূর্বে শিরক মিশ্রিত ভেজাল ঈমান তাদের পার্থিব জগতের এবং পরকালের কোন বিধানের ব্যাপারে সামান্যতম উপকারেও আসেনি। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করা স্বত্ত্বেও মুশরিক' [সূরা ইউসুফ-১০৬]

আর শিরক হলো ঈমানকে নষ্টকারী এবং নেক আমল ধ্বংসকারী। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

'যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সকল কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে' [সূরা যুমার-৬৫]

সকলের জানা আছে এ সমস্ত শাসকেরা পাশ্চাত্যের তাগুতদেরকে (ব্রিটিশ সরকার, আমেরিকান সরকার, কানাডিয়ান সরকার ইত্যাদি যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়নকারী ও বাস্তবায়নকামী জনতার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।) এবং প্রাচ্যের তাগুতদেরকে (ভারত সরকার, চীন সরকার, জাপান সরকার ইত্যাদি) অস্বীকার করেনা। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেনা। বরং এরা তাদেরই আস্থাভাজন ও তাদেরকেই ভালোবাসে এবং ঝগড়া বিবাদে তাদের নিকট মামলা দায়ের করে। তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ম অর্থাৎ কুফরী বিধানসমূহকেই পছন্দ করে। তাদের সৃষ্ট আন্তর্জাতিক কুফরী সংস্থা জাতিসংঘের অপবিত্র ছায়ায় আশ্রয় নেয়। এভাবে আরবী (এরাবিয়ান তথা আরবের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী শাসকেরা যারা কাফেরদের কাছে আল্লাহর একক্বত্বে বিশ্বাসী মুসলিমদের এবং ইসলামী খিলাফতকামী মুসলিমদের তুলে দেয় কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করার জন্য) তাগুতরা এবং তাদের নীতি সমূহ আন্তর্জাতিক কুফরি সংস্থা জাতিসংঘের নীতির মতই। আর এরা, এসকল তাগুতদেরকেই ভালোবাসে এবং তাদের সাথেই বন্ধুত্ব রাখে। আর তাদের এমন গোলামে পরিণত হয়েছে যে, কোন বিষয়েই মনিবের অবাধ্য হয় না এবং শিরক, কুফর সকল কাজেই মনিবের শক্তি যোগায়। চোখে পর্দা থাকার কারণে কারো কারো নিকট এই সমস্ত শাসকদের তাগুত হওয়ার বিষয়টি যদিও সংশয়যুক্ত কিন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য কাফিরদের তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কারো সামান্যতম সংশয় নেই (কাউকে যদি আল্লাহ অন্ধ করে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।) এ সত্ত্বেও তাদেরকে বর্জন করাতো দূরের কথা বরং এ শাসকরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সদা সচেষ্ট। এমনকি তাদের সাথে জাতিসংঘ নামের কুফরি সংঘ চুক্তিতেও আবদ্ধ। ফলে কোন সমস্যা দেখা দিলে এরা জাতিসংঘের কুফরি আদালতে মামলা দায়ের করে। অতএব তারা তাওহীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি আল কুফরু বিত তাগুত(তাগুতকে অস্বীকার) পূর্ণ করেনি। সুতরাং কিভাবে তারা মুসলমান হতে পারে? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয়, তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি আল ঈমানু বিল্লাহ (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) পূর্ণ করেছে। কিন্তু অপরদিকে তারা নিজেরাই তাগুত সেজে বসে আছে। ফলে আল্লাহ ব্যাতিরেকে তাদের ইবাদত করা হচ্ছে। কারণ তারা মানুষের জন্য এমন সব আইন প্রণয়ন করেছে যার অধিকার আল্লাহ (সুবঃ) কোন মাখলূককে দেননি। উপরন্তু তারা মানুষদেরকে সেদিকে

আহ্বানও করছে এবং তাদের সংবিধান মানতে বাধ্য করছে। (যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসছে)

-**কুফরীর দ্বিতীয় কারণঃ** আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন এবং শরীয়ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার কারণে তারা কাফির।

তারা আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়াত নিয়ে বিদ্রুপকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা(বিদ্রুপকারীরা) পত্রিকা, রেডিও, টিভি এবং অন্যান্য স্বাধীন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য এবং আকার ইঙ্গিতে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে। আর এ কুলাঙ্গার শাসকবর্গরা এ মাধ্যমগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে (আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সমাজে যারা রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, ইসলাম নিয়ে মশকরা করে তাদেরকে শাসকবর্গরা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে)। সাথে সাথে তাদের স্ব-রচিত আইন এবং সেনাবাহিনী দ্বারা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এ নাস্তিক মুরতাদদের আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

...বলো ! তোমরা কি এক আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলে? অজুহাত দেখিওনা- তোমরা তো ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছো... [সূরা তাওবা-৬৫,৬৬]

এই আয়াতগুলো ঐ সকল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ছিলো মুসলিম। তারা সালাত আদায় করতো, সিয়াম পালন করতো ও যাকাত দিত এমনকি তারা মুসলিমদের সাথে এক বড় জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিলো। ইহা সত্ত্বেও যখন তারা কোরআন পাঠকারী সাহাবীদের ব্যাপারে উপহাসমূলক কথা বলল, তখন আল্লাহ (সুবঃ) তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন।

যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আর তিনি এ কথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন, ওদিয়া ইবনে ছাবেত বিন আমর বলল, আমরা শুধুমাত্র তোমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করছি এবং সে আরো বলল, হায়! কি হল যে, এই কুরআন পাঠকারীরা দেখি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাদ্যের প্রতি বেশি উৎসাহী, আর শত্রুর মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশি

ভীরু। [তাবারানির মু'জামুল কাবিরঃ ৩০১৭; প্রত্যেক রাবি আলাদা আলাদা ভাবে সিকাহ, তবে সনদটি গারিব। মোটকথা হাদিসটি হাসান স্তরের তাই গ্রহণযোগ্য।]

তাহলে ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে চিন্তা করুন যাদের অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই বরং তাকে হাসি-তামাশার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। নিজেদের পিছনে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে মেরেছে। আর সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হল তারা আল্লাহর কুরআনকে তথা কুরআনের বিধি-বিধানকে তাদের স্বহস্তে রচিত আইন-কানুনের নিচে অবস্থান দিয়েছে। কুরআনের আদেশ এবং নিষেধ সমূহকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান ও নাস্তিকদের সাথে সলাপরামর্শ করে রদ করছে (তারা বলে কুরআনের বিধানগুলো নাকি মানবতাবিরোধী বর্বর)। কিতাবুল্লাহ'র সাথে এর চেয়ে বড় উপহাস ও ঠাট্টা আর কি হতে পারে?

-**কুফরির তৃতীয় কারণঃ** তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখার কারণে এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার কারণে কাফির।

এই সমস্ত শাসকরা কাফিরদের সাথে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মুওয়াহহিদ(আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী) মুসলমানদেরকে জঙ্গি ও চরমপন্থী আখ্যা দিয়ে উক্ত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংবাদ কাফিরদের সাথে আদান-প্রদান করে এবং মুসলিম মুজাহিদদের গ্রেফতার করে তাগুত সরকারদের হাতে অর্পণ করে। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।'[সুরা মায়িদা- ৫১]

একারণেই শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাওয়াক্বিদুল ইসলাম নামক গ্রন্থে বলেন, ঈমান নষ্ট হওয়ার ৮ নং কারণ হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

তার দৌহিত্র সুলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহহাব তার হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

'আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

'তুমি কি মুনাফিকদের দেখনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদের বলে, 'তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।'[সুরা হাশর- ১১]

এই আয়াত গুলো অবতীর্ণ হয়েছে, এমন কিছু মানুষের ব্যাপারে, যারা বাহ্যিক ভাবে ইসলামকে প্রকাশ করতো। একজন ব্যক্তি মুসলিম কি কাফির তার প্রমাণস্বরূপ তাদের বাহ্যিক প্রকাশকেই গ্রহণ করা হত। কেননা মুসলমানদের প্রতি হুকুম ছিল বাহ্যিকতার বিচার করার। কিন্তু যখন তারা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের সাহায্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল (যদিও আল্লাহ তা'য়ালা জানতেন তাদের চুক্তিতে তারা মিথ্যাবাদী) তখন আল্লাহ(সুবঃ) ইয়াহুদিদেরকে তাদের ভাই বলে আখ্যা দিলেন। আর এ চুক্তিই ছিল তাদের কুফরির কারণ।' [হুকুম মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক]

অতএব ঐসমস্ত শাসকদের পরিণতি আর কত করুণ, যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আইন প্রণয়নকারী মুশরিকদের সাথে পরস্পর সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তাওহিদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদেরকে আপন মনিবদের(আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য কাফির রাষ্ট্রের সরকারের) হাতে অর্পণ করে। কোন সন্দেহ নেই, অবশ্যই তারা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

-**কুফরির চতুর্থ কারণঃ** আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করার কারণে তারা কাফির।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলামই।'[সুরা আল ইমরান- ১৯]

ইসলাম হল আল্লাহর দ্বীনে হাক্ব, যা দিয়ে তিনি মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রেরণ করেছেন। আর গনতন্ত্রের প্রবর্তক হল গ্রীকরা। নিঃসন্দেহে না এটা আল্লাহ প্রদত্ত, না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ ‘সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে?'[সুরা ইউনুস- ৩২]

আর এ সকল লোকেরা সর্বদাই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করছে যে, তাদের একমাত্র পছন্দ ও গর্বের বিষয় গনতন্ত্র, ইসলাম নয়। গনতন্ত্র ও ইসলাম এ দুটি পরিপূর্ণ ভিন্ন বিষয়। দুটিকে একত্র করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা’য়ালা একমাত্র খালেছ ইসলামকেই কবুল করবেন। আর ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে,

‘বিধান একমাত্র আল্লাহর।'[সুরা আন’আম- ৫৭, সুরা ইউসুফ- ৪০]

আর গনতন্ত্র হল একটি শিরক ও কুফর মিশ্রিত জীবন বিধান। যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিধি-বিধান এবং আইন প্রণয়নকারী হিসেবে জনগণকে সাব্যস্ত করে। [যেমন বাংলাদেশ সংবিধান ৭/ক ধারা হল ‘সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’ বা ‘সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ’।] আর আল্লাহ রব্বুল আ’লামিন এমন মানুষের আ’মল কখনোই গ্রহণ করবেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না যে কুফরকে গ্রহণ করে আবার ইসলামেরও দাবী করে, শিরকও করে আবার তাওহীদেরও বুলি আওড়ায়। বরং কোন ব্যক্তির ইসলাম ও তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সঠিক বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল দ্বীনকে অস্বীকার না করে এবং সকল শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত না হয়।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছেঃ...

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَىْءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

...নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সেই কওমের দ্বীন যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে। আর আমি অনুসরণ করছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়।'[সুরা ইউসুফ- ৩৭, ৩৮]

এবং সাহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'আবি মালিক রাঃ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাঃ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করল সে তার মাল-সম্পদ, রক্ত এবং হিসাবকে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপদ করে নিল।' [সাহিহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমানঃ ৩৭-(২৩)] অন্য রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে মান ওয়াহহাদাল্লাহ 'যে আল্লাহ কে মেনে নিল' [সাহিহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমানঃ ৩৮-(২৩)]

দ্বীন বা জীবন বিধান বলতে শুধুমাত্র ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মকে বুঝায়না বরং গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা এধরনের মানব রচিত যত বিধান আছে সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আবশ্যক হল এ ধরনের সকল মিথ্যা ধর্ম এবং বাতিল মতবাদ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে, যাতে আল্লাহ আমাদের থেকে দ্বীন ইসলামকে কবুল করেন। যেমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এই বৈধতা ও সম্ভাবনা নেই, কোন মানুষ 'খ্রিষ্ট মুসলমান' বা 'ইয়াহুদি মুসলমান' হবে তেমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) এটাও পছন্দ করেন না যে, কোন ব্যক্তি 'গণতন্ত্রী মুসলমান' হবে। কেননা ইসলাম হল আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন আর গনতন্ত্র হল একটি কুফরি মতবাদ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْاٰخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[সুরা আলে ইমরান- ৮৫]

আর যদি কোন ব্যক্তি ইসলামকে ছেড়ে দেয় এবং ইসলামের সীমারেখা, বিধি-বিধান অবজ্ঞা করে এবং গণতন্ত্রকে পছন্দ করে ও তার আইন-কানুন ও সীমারেখাকে গ্রহণ করে তাহলে তার অবস্থা কতই না শোচনীয়!

-**কুফরির পঞ্চম কারণঃ** তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করার কারণে কাফির।

যে (বাতিল) দ্বীনকে তারা নিজ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এটাই তাদের নিকট আল্লাহ'র (সুবঃ) চেয়ে অধিক সম্মানিত! তাইতো তারা আল্লাহর বিধান সমূহকে পরিত্যাগ করেছে এবং দেয়ালের পিছনে ছুড়ে মেরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধিতা করে বা বিপক্ষে যায় এবং এর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও যুদ্ধে অবস্থান নেয় সে-ই তাদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। তাকে নিজেদের আইন দ্বারা রক্ষা করে। সে মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি মুখরোচক স্লোগান তুলে তার জন্য সাফাই গাওয়া হয়। আর যদি কেউ তাদের নিয়মের বিরোধিতা করে এবং তাদের বিধি-বিধানকে তিরস্কার করে, তাদের শাসকদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে হয়ত তাকে তাদের রোষানলে পতিত হয়ে জীবন হারাতে হয়! অথবা তাকে বন্দী করে রাখা রাখা হয়! পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ (সুবঃ) এবং তাঁর রাসুল সাঃ কে অথবা ইসলামকে গালি দেয়, অতঃপর যদি তাকে আদালতে নেয়া হয় তাহলে তার বিচার হয় বেসামরিক আদালতে এবং তার শাস্তি হয় দুই মাস! এর বিপরীতে কেউ যদি তাদের বানানো ইলাহ বা রব তথা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এবং তাদের দোসরদের গালি দেয় তাহলে তার বিচার হয় উচ্চ আদালতে এবং কমপক্ষে তার শাস্তি হয় তিন বছর! যদি আল্লাহ সুবঃ এর জন্য তাদের সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকতো তাহলে তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহ (সুবঃ) এর সমতুল্য করত না। উপরন্ত তারা এর চেয়ে আগে বেড়ে তাদের রবদেরকে (শাসকদেরকে) আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মান করে। প্রথম যুগের মুশরিকরাও তাদের শরীকদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসত এবং তারা তাদের রবদেরকে (সমাজপতিদের) বিধান প্রণয়ন, সম্মান প্রদান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করতো। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ

‘এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মতো।'[সুরা বাক্বারা- ১৬৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ: إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

‘(জাহান্নামে কাফিররা তাদের শরীক ইলাহদের ব্যাপারে বলবেঃ) আল্লাহর কসম! আমরাতো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রব্বুল আ’লামিনের সমকক্ষ গণ্য করতাম।'[সুরা শু’আরা- ৯৭, ৯৮]

আর আমাদের সময়ের মুশরিকরা তাদের চেয়ে অধিক ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তাদের রবদেরকে আল্লাহর উপরে স্থান দিয়েছে। (তারা যা কিছু বলে আল্লাহ তা’য়ালা তার অনেক ঊর্ধ্বে)। তাদের আইন-কানুন এবং অবস্থা সম্পর্কে যার সামান্যও অবগতি রয়েছে সে এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলতে পারে না। সামনের আলোচনা থেকে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে, তাদের নিকট প্রধান বিধানদাতা আল্লাহ রব্বুল আ’লামিন নন, বরং তারা যাদের প্রণীত আইনের অনুসরণ করে সে সকল তাগুতই হল তাদের মূল ইলাহ। যাদেরকে তারা ভালবাসে এবং আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মান করে। যাদের জন্য এবং যাদের বিধি-বিধানের জন্য তারা লড়াই করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করে এমনকি তা বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের কষ্ট স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকে। যদি আল্লাহর দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাঁর শরীয়তকে গালি দেয়া হয় তাহলে তারা সামান্য প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করে না। (বর্তমান সময়ের বাস্তব চিত্রই তার বড় প্রমাণ।)

-**কুফরির ষষ্ঠ কারণঃ** আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করার কারণে তারা কাফির।

নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন এটা বর্তমান সময়ের একটি সর্বগ্রাসী শিরক। যার প্রচলন ঘটিয়েছে এই কুলাঙ্গার শাসকবর্গ এবং মানুষদেরকে তার দিকে আহ্বান করছে। প্রতিনিয়ত এ কাজে সদস্য হতে এবং অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তাদের সংবিধানে আল্লাহর তাওহীদ এবং সঠিক দ্বীনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করছে। আর সংবিধান তাদেরেকে সকল বিষয়ে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা

দিয়ে থাকে। [বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদে ৭ এর (ক) ধারায় উল্লেখ আছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগনের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"] যেমন জর্ডানের সংবিধানের ২৬ এর (ক) ধারা হলঃ "আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাদশা এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকবে।" সংবিধানের ২৬ এর (খ) ধারায় আছেঃ "আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী হবে।"

আল্লাহ (সুবঃ) মুশরিকদের ধিক্কার দিয়ে বর্ণনা করেছেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?'[সুরা শু'রা- ২১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

'হে কারাসঙ্গীরা! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, নাকি ঐ এক আল্লাহ যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী।'[সুরা ইউসুফ- ৩৯]

শুধুমাত্র একটি মাস'য়ালার ক্ষেত্রেও মুশরিকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে।[সুরা আন'আম- ১২১]

এ কথা স্পষ্ট যে, তারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করেছে। জর্ডানের সংবিধানে উল্লেখ আছেঃ 'আইন প্রণয়নের উৎস সমূহ থেকে প্রধান উৎস হল ইসলামি শরীয়ত।'[৪]

অর্থাৎ তারা আইন প্রনয়নে আল্লাহর একক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের ছোট বড় অনেক উৎস রয়েছে। আর ইসলামি শরীয়ত হল এ সমস্ত উৎসের একটি।

সারকথা হলঃ তাদের জন্য বিধানদানকারী অনেক প্রভু রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ বা প্রধান আবার কেউবা ছোট। আর আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন হলেন এসব প্রভুদের মধ্য থেকে একজন (তারা যা মিথ্যা বলে আল্লাহ সুবঃ তার থেকে অনেক উর্ধ্বে)। এই শাসকদের বিধি-বিধান সম্পর্কে যিনি অবগত তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন, তাদের মধ্যে একজন প্রধান থাকে। যার অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন পাশ হয় না বা বাতিল হয় না। এই তাগুতই হল তাদের প্রধান বিধানদাতা বা রব। চাই সে বাদশা হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট হোক অথবা হোক কোন আমীর।

যদি আসমানে অবস্থিত মহান রবের বিধান থেকে কোন কিছুর প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাহলে তাদের মনোনীত পৃথিবীর এই মিথ্যা রবের সন্তুষ্টি এবং অনুমোদন ব্যতীত তা বাস্তবায়ন হয় না। যদি সে অনুমোদন না করে তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। আর এদের কুফর কুরাইশ কুফফারদের চেয়েও জঘন্যতম। কেননা তারা আল্লাহর সাথে একাধিক 'ইলাহ' এবং বহু রবের শরীক করতো, আর এ শিরক ছিল শুধু ইবাদত তথা রুকু, সিজদার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে এই তাগুতরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে। যার দুঃসাহস তৎকালীন মুশরিকরাও দেখাতে পারেনি। ফলে এদের শিরক হল অত্যধিক জঘন্য ও ঘৃণিত। কেননা কুরাইশের মুশরিকরা আল্লাহ (সুবঃ) কে তাদের সবচেয়ে বড় এবং মহান রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল তারা এ সমস্ত মূর্তির পূজা করে যাতে করে এরা তাদেরকে আসমানে অবস্থিত মহান রব আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের নিকটবর্তী করে দেয়।

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

‘(মুশরিকদের উক্তি) আমরা কেবল এজন্যই ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।'[সুরা যুমার-৩]

তাদের কেউ কেউ আবার হজ্জের সময় তালবিয়া পাঠ করতঃ

‘হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই কিন্তু একজন যার মালিক তুমি স্বয়ং এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর অধিকার তোমারই।'[সাহিহ মুসলিমঃ কিতাবুল হাজ্জ- ২২-(১১৮৫)]

এই সমস্ত মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ (সুবঃ) রিযিক্ব দান করেন। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফসল উৎপন্ন করেন, সুস্থতা দান করেন। যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন, আর যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন। অথবা কাউকে উভয়টা দিয়ে থাকেন কিংবা কাউকে বন্ধ্যা বানান। এগুলোর কোনটার ক্ষমতা তাদের বাদশা বা সরকারের নেই। কিন্তু বর্তমান শাসকদের সাহায্যকারী সাংবাদিক, সৈনিকসহ অন্যান্য সরকারি আমলাদের বিশ্বাস হল আইন প্রণয়ন করা এবং বিধি-বিধান প্রবর্তনের ক্ষমতা তাদের এই সমস্ত শাসক বা রবদের আছে। আর এই তাগুতগুলোই হল তাদের জমিনের ইলাহ। এরা শিরকের ক্ষেত্রে কুরাইশ কুফফারদের মতই। কিন্তু এরা এইসব ইলাহদের আদেশ নিষেধ এবং আইন কানুনকে আল্লাহর বিধি-বিধানের চেয়ে বেশি সম্মান করে থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে আবু জাহেল আবু লাহাবের চেয়েও নিকৃষ্টতম কাফির। জেনে রাখা উচিৎ! এই সমস্ত লোকদের কুফর ও শিরকের আর অনেক কারণ রয়েছে। আমরা যদি সবগুলি এখানে উল্লেখ করি তাহলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কুফরির প্রায় সকল কারণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। বরং এই ক্ষেত্রে তারা অনেক আগে বেড়েছে। কিন্তু যা আলোচনা হল তা-ই সত্যসন্ধানীর জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহ (সুবঃ) যদি কারো অন্তরে মহর অংকিত করে দেন আর তার সামনে পাহাড় সমান প্রমাণ পেশ করা হয় তাহলে সেটাও তার কোন কাজে আসবে না। তথাপি সে সত্য অনুসন্ধান করবে না। এই অধ্যায়গুলোতে আমরা যা বুঝাতে চেয়েছি তা হলো এই সমস্ত লোকদের কুফরি শুধুমাত্র একটি কারণে নয় যা কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি বা সংশয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বরং তারা শিরক ও কুফরের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত।

টীকাঃ

[১] বড় কুফরঃ যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা বিধান উঠে যায়। যেমন- আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করা।*

[২] ছোট কুফরঃ এটা বড় কুফরের বিপরীত, অর্থাৎ তা কোন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না, তবে তা অনেক অনেক বড় গুনাহ। যেমন- কোন নির্দোষ মুসলিমকে স্বেচ্ছায় হত্যা করা।*

[৩] ইমাম ইবনে জারীর আত তাবারি বলেনঃ ত্বগুত হল, ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আনুগত্য করে। সে মানুষ, জীন, শয়তান, প্রতিমা বা অন্য কিছু হতে পারে। (তাফসিরে তাবারি- ৩/২১)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই ত্বাগুত।(মাজমু'আতুল ফাতওয়া- ২৮/২০০)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বলেনঃ ত্বাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট।(মাজমু'আতুত তাওহীদ- পৃষ্ঠাঃ ৯)*

ইমাম কুরতুবি রহঃ বলেনঃ ত্বাগুত হচ্ছে গণক, যাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা।(আল জামি' লি আহকামিল কুরআন- ৩/২৮২)*

ইবনুল কায়্যিম বলেনঃ ত্বাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। আল্লাহ ও তার রাসুলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যেসব গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা হয়। এরাই হল পৃথিবীর বড় বড় ত্বাগুত। তুমি যদি এই ত্বাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে বেশীরভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে ত্বাগুতের ইবাদাত করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়ার পরিবর্তে ত্বাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার পরিবর্তে ত্বাগুতের আনুগত্য করে।(এ'লামুল মুওয়াক্কীঈন- ১/১৫০)

ইমাম আব্দুর রাহমান বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয়, যারা বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সজ্জিত-মন্ডিত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে; এমনিভাবে গণক, যাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবর পূজার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, যারা মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে মাজারের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে; এরা সকলেই ত্বাগুত। এদের লিডার হচ্ছে শয়তান।(আদদুরারুস সানিয়্যাহ- ২/১০৩)

মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফক্বী বলেনঃ আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাত করা হতে যারা মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয় (চাই সে জীন, মানুষ, গাছ, পাথর যাই হোক না কেন); এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে মনগড়া আইনে হুদুদ, কিসাস, যিনা-ব্যভিচার, মদ এবং সুদ ইত্যাদির বিচার ফায়সালা করে।(হাশিয়া ফতহুল মুজিদ- পৃষ্ঠাঃ ২৮২)

[৪] আর বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ৭ এর (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

(সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের প্রধান উৎস হিসেবে তো দূরের কথা, শাখা উৎস হিসেবে ইসলামী শরীয়ত নেই)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৬১

সংশয় নিরসন; ই'দাদ কি শুধু রাষ্ট্রেরই দ্বায়িত্ব

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-২৭-২০১৯

বর্তমানে আলেমদের গাঁ বাচানোর একটি কৌশল হলো, দ্বীনের যে কাজগুলো করতে সরকার বাধা দেয়, সেগুলো সরকারের দ্বায়িত্ব বলে চালিয়ে দেওয়া এবং সরকারকে সেগুলো করার জন্য নসীহত করা। সরকার পর্যন্ত তাদের নসীহত পৌঁছল কিনা এবং কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী দালাল সরকার সেগুলো শুনবে কিনা তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। বরং তারা নিজেদের মহান দ্বায়িত্ব (?) আদায়ের জন্য কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা বক্তীতায় সরকারকে নসীহত করে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করে। আসলে তারা নিজেরাও জানেন তাদের নসীহতে কোন কাজ হবে না।

তো এরকমই একটি বিষয় হলো ই'দাদ বা জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতি। তারা এই মহান ফরীযাকে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন এবং কারণও বলে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা তোমরা কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করবে, যেন তারা মুসলমানদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায় এবং মুসলমানরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত না হয়।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

(তোমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখো, তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বাবল-সুরা আনফাল, ৬০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতে সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝে আসে ইদাদ ফরযে আইন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকিহ ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ীর (মৃ: ৭৪৩ হি.) বক্তব্য থেকেও এমনটাই বুঝে আসে, যা আমরা সামনে উল্লেখ করবো। আর এ মতটি খুবই যুক্তিসংগত, কেননা শত্রু আক্রমণ করলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে

যায়। আর শত্রু তো যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে, তাই যে কোন সময় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যেতে পারে। এখন যদি আগে থেকে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ না করা হয় তাহলে অস্ত্র হাতে তুলে দিলেও তো আমরা তা চালাতে পারবো না। তখন সেই অস্ত্র দ্বারা নিজেদের মাথায় আঘাত করা ছাড়া আমাদের আর কি বা করার থাকবে?

অবশ্য অনেক মুফাসসির বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় ইদাদ ফরযে কেফায়া, তবে কখনো কখনো তা ফরযে আইন হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকে তখন ইদাদও ফরযে কেফায়া থাকে আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন ইদাদও ফরযে আইন হয়ে যায়। তো খোলাসা হলো, আলেমগণ কেউ ইদাদকে ফরযে আইন বলেছেন আর কেউ ফরযে কেফায়া বলেছেন, আর ফরযে কেফায়ার অর্থ হলো, প্রয়োজন পরিমাণ মানুষ তা করলে অন্যরা গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে, অন্যথায় সকলেই গুনাহগার হবে। কিন্তু কোন মুফাসসিরই ই'দাদকে শুধু রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব বলেননি। সুতরাং বর্তমানে কিছু কিছু আলেমদের নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য ই'দাদকে রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব বলা এবং রাষ্ট্র তা না করলে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকা, মুফাসসিরদের সর্বসম্মত মত পরিপন্থী একটা মুহদাস বা বেদআতী কথা।

এখানে একথা বলারও সুযোগ নেই যে, ইদাদের জন্য বিরাট বাজেট, বড় প্রকল্প ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন, যা সাধারণত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। কেননা মুফাসসিরগণ এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইদাদের জন্য সর্বোচ্চ শক্তি অর্জন করতে হবে, এটম/পারমানবিক বোমা বানাতে হবে, এটা জরুরী নয়, বরং মুসলমানদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তি অর্জন করবে, হোক তা একটি সাধারণ পিস্তল বা ক্লাশিনকোভ। দেখুন, আজ, আমরা নিরস্ত্র হওয়ায় ওরা বীরের বেশে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের মারছে, আমাদের মারতে কোন পরোয়া করছে না। এটাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

'কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও সামানাদি থেকে অসর্তক হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে'। -সূরা নিসা, আয়াত, ১০২

এখন আমাদের অবস্থা হয়েছে বৃদ্ধ বাঘের মত যে তার থাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাই ভীতু শিয়ালের পালও তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায়। কিন্তু যদি আমাদের সবার হাতে একটি সাধারণ পিস্তলও থাকতো, তাহলে দেখে নেওয়া যেত, ওই ন্যাড়া বৌদ্ধ ও হিন্দু মালাউনদের বুকের পাটা কতটুকু। ওদের তো দুনিয়াই সব, মৃত্যুর পরে ওদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি, আর আমাদের জন্য দুনিয়া জেলখানা, শাহাদাতের মৃত্যু আমাদের পরম আরাধ্য। ওরা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়, আর আমরা মৃত্যুকে হন্য হয়ে খুজে ফিরি। সুতরাং যদি জিহাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আমাদের অতি সাধারণ সামরিক প্রস্তুতিও থাকতো তাহলে ওরা কখনোও আমাদের সাথে লাগতে আসার সাহস পেত না ইনশাআল্লাহ। ওরা এজন্যই আমাদের মারতে পারছে যে, আমরা কুরআন-সুন্নাহ আমাদের যেভাবে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য পাগল বানাতে চেয়েছিল, আমরা তা না হয়ে উল্টো দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার নামে জিহাদবিদ্বেষী হয়ে বসে আছি, মুনাফিকদের গুণ মৃত্যুর ভয় নিজেদের মাঝে ধারণ করে ভীরু কাপুরুষ হয়ে গেছি, আর ইদাদকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে নিজেরা তা সম্পূর্ণরুপে বর্জন করেছি। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে রাসূলের ভবিষ্যতদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে, 'অচিরেই তোমাদের (হত্যা এবং তোমাদের দেশ ও সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একে অপরকে আহ্বান করবে, যেভাবে দস্তরখানে উপবেশনকারীরা খাবার গ্রহণের জন্য একে অপরকে আহ্বান করে। ... তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক, কিন্তু তোমরা হবে ভাসমান খড়কুটোর ন্যায় (প্রভাবহীন)। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্তর হতে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন আর তোমাদের অন্তরে ঢেলে দিবেন ওয়াহান ... (অর্থাৎ) দুনিয়ার ভালোবাসা ও (শহিদি) মৃত্যুতে অনীহা'।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯৭ মুসনাদে আহমদ ২২৩৯৭, শায়েখ আওয়ামা ও শায়েখ শুয়াইব হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন, সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক শায়েখ শুয়াইব, ৬/৩৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, তাহকীক, শায়েখ আওয়ামা, ২১/৯২ মুসনাদে আহমদের আরেক হাদিসে (৮৭১৩) আছে, **وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال** 'ওয়াহান হলো, দুনিয়ার ভালোবাসা ও যুদ্ধকে অপছন্দ করা'। এ হাদিস প্রমাণ করে পূর্বোক্ত হাদিসে 'মৃত্যুকে অপছন্দ করা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শহিদি মৃত্যুকে অপছন্দ করা)

অনেকে প্রশ্ন করেন, রোহিঙ্গারা যখন মরছেই তো ওরা তো মেরেও মরতে পারে, শুধু শুধু কেন মরছে? কিন্তু ভাইয়েরা, জেনে রাখুন, লড়াই করে মরার জন্যও অস্ত্রের প্রয়োজন। কেননা অস্ত্রধারীদের সাথে খালিহাতে মোকাবেলার জন্য যে অসীম সাহসের প্রয়োজন তা অধিকাংশ লোকেরই থাকে না। পক্ষান্তরে অস্ত্র হাতে পেলে ভীরুও সাহসী হয়ে উঠে।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল, তো চলুন, এবার আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরদের বক্তব্যগুলো দেখি।

১. খেলাফতে উসমানীয়ার শাইখুল ইসলাম হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ও মুফাসসির আল্লামা আবুস সাউদ আফেন্দী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৯৮২ হি.) বলেন,

{وَأَعِدُّواْ لَهُمْ} توجيهُ الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمورَ به من وظائف الكلِّ، ... {مَّا استطعتم مّن قُوَّةٍ} من كل ما يُتقوَّى به في الحرب كائناً ما كان (تفسيير أبي السعود 4/32 :ط. دار إحياء التراث العربي)

আল্লাহ তাআলার বাণী **وَأَعِدُّوْا لَهُمْ** (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই দায়িত্ব। ... **مَّا استطعتم مّن قُوَّةٍ** (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু চাই, তা যাই হোক না কেন। - তাফসীরে আবুস সাউদ, ৪/৩২

২. হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেম আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলূসী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ১২৭০) তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ রুহুল মাআনীতে হুবহু একই কথা বলেছেন, তার ইবারত দেখুন,

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل .... {مَّا استطعتم مّن قُوَّةٍ} من كل ما يُتقوَّى به في الحرب كائناً ما كان. (روح المعاني: 220/5 ط. دار الكتب العلمية: 1415 ه)

আল্লাহ তাআলার বাণী (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই

দায়িত্ব। ... (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু, চাই তা যাই হোক না কেন। -রুহুল মাআনী, ৫/২২০

৩. তাফসীর জগতের উজ্জল নক্ষত্র ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু ৬০৬ হি.) বলেন,

قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ... وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة، إلا أنه من فروض الكفايات. (التفسير الكبير 15/499 :ط. دار إحياء التراث العربي: 1420 هـ)

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে قوة শব্দ দ্বারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক সব কিছু উদ্দেশ্য, সুতরাং যা কিছুই যুদ্ধের মাধ্যম হয় তাই قوة বা শক্তির অন্তর্ভূক্ত। ... এ আয়াত থেকে বুঝে আসে জিহাদের জন্য তীর, অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অশ্বচালনা ও তীরন্দাজী শিক্ষা করা ফরয, তবে তা ফরযে কেফায়াহ। -তাফসীরে রাযী, ১৫/৪৯৯

৪. ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৬৭১ হি.) বলেন,

قوله تعالى: "وأعدوا لهم" أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب، كما فعل رسول الله ﷺ. ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك... وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. (تفسير القرطبي: 8/35-36 ط. دار عالم الكتب)

আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অর্জনে গুরুত্বারোপ করার পর মুমিনদের শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে ওদেরকে কথা, চেহারায় থুথু নিক্ষেপ বা (ওদের দিকে) একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করার দ্বারাই পরাজিত করতে পারতেন, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কিন্তু তিনি তার ইলম ও ফয়সালা অনুযায়ী কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। তুমি তোমার বন্ধুর জন্য যা কিছু ভালো, এবং শত্রুর জন্য যা কিছু মন্দ প্রস্তুত করে রাখো, তার সবই বা প্রস্তুতিগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৫-৩৬

৫. আল্লামা আবু হাইয়ান আন্দালূসী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৭৪৫ হি.) বলেন,

والمخاطبون هم المؤمنون ... والظاهر :العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدو مما أورده المفسرون على سبيل الخصوص، والمراد به التمثيل، كالرمي وذكور الخيل وقوة القلوب واتفاق الكلمة والحصون المشيدة وآلات الحرب وعددها والأزواد والملابس الباهية، حتى إن مجاهدا رُئي يتجهز للجهاد، وعنده جوالق، فقال: هذا من القوة. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهو على المنبر، يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي». فمعناه، والله أعلم: أن معظم القوة وأنكاها للعدو :الرمي، كما جاء: «الحج عرفة». (البحر المحيط: 343/5 ط. دار الفكر: 1420 ه)

এ আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করা হয়েছে, (অর্থাৎ প্রস্তুতির আদেশ সব মুমিনের জন্য) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ হলো, এখানে قوة (শক্তি) দ্বারা ঐ সব কিছুই উদ্দেশ্য যেগুলো মুফাসসিরগণ দৃষ্টান্তরুপে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তীরন্দাযী, অশ্ব প্রস্তুত রাখা, সাহসিকতা, একতা, মযবুত দূর্গ, যুদ্ধের সামগ্রী, পাথেয়, রেশমী কাপড় (যা শত্রুর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়) এমনকি এক মুজাহিদকে স্বপ্নে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়, তার কাছে কিছু থলি ছিল, তিনি বললেন, এগুলোও قوة বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আর সহিহ মুসলিমে উকবা বিন

আমের রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিস, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই শক্তি হলো নিক্ষেপণ শক্তি, নিশ্চয়ই শক্তি হলো, নিক্ষেপণ শক্তি' তো এই হাদিসের অর্থ হলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শত্রুদের বিপক্ষে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হলো নিক্ষেপণ শক্তি। - আলবাহরুল মুহিত, ৫/৩৪৩

৬ - গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম শায়েখ জামালুদ্দীন কাসেমী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৩২ হি.) বলেন,

وأما اليوم، فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة، ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضا من فروض الكفاية، فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض. (محاسن التأويل: 316/5 ط. دار الكتب العلميه: 1418 ه)

আজ মুসলমানরা এই আয়াতের উপর আমল না করে ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং একটি ফরযে কেফায়া দ্বায়িত্ব পালন ছেড়ে দিয়েছে। তাই পুরো উম্মাহই ফরয তরকের দায়ে গুনাহগার হয়েছে। -মাহাসিনুত তা'বীল, ৫/৩১৬

৭ - হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকিহ ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রহ. (মৃ: ৭৪৩ হি.) বলেন:

وفي الجامع الصغير: الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة، حتى يُحتاج إليهم، فقوله: «في سعة» إشارة إلى أن مباشرة القتال لا تجب في كل وقت، بل الاستعداد له كافٍ، وقوله: «حتى يُحتاج إليهم «إشارة إلى أن مباشرة القتال فرض على الكل عند الحاجة إليهم، وهو النفير العام، لأن المقصود حينئذ لا يحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض عليهم مباشرته) .تبيين الحقائق: 242/3 ط. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: 1313 ه)

জামিউস সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: 'জিহাদ ফরয, তবে – সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার - প্রয়োজন না পড়লে মুসলমানদের জন্য জিহাদে না যাওয়ারও অবকাশ আছে'। মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য : 'না যাওয়ারও অবকাশ আছে' এ

থেকে বুঝা যায়, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখাই যথেষ্ট। আর তাঁর বক্তব্য: 'সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন না পড়লে' এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজন পড়লে সকলের উপরেই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয। আর প্রয়োজনের সময়টি হচ্ছে যখন 'নফীরে আম' এর হালত তৈরী হয়ে যায়। কেননা, তখন সকলে যুদ্ধে বের হওয়া ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কাজেই তখন সকলের উপরই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয হবে। - তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৪২

৮ - শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) বলেন:

وجعلوه إحدى فروض الكفايات، وقد يكون فرض عين على أهل القدرة من الذكور، شأنه في ذلك شأن الجهاد، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. اهـ

আইম্মায়ে কেরাম ই'দাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। তবে সক্ষম পুরুষদের উপর কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। এর হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া দুই ভাগে বিভক্ত; ই'দাদও তেমনি। -ফতওয়া ফী তাওজীহিল উম্মাহ, পৃ: ১০

ইদাদের সাথে সম্পৃক্ত ইলমী বিষয়গুলো নিয়ে মুফতী আব্দুল ওয়াহহাব হাফিযাহুল্লাহু 'ইদাদ একটি ভুলে যাওয়া ফরয' নামে একটি খুবই উপকারী কিতাব রচনা করেছেন। আমি কিতাবটির লিংক দিয়ে দিচ্ছি। যারা কিতাবটি পড়েননি তারা ইদাদের মাসায়েল জানার জন্য কিতাবটি পড়ে নিতে পারেন। তাহলে ইদাদের বিষয়গুলোতে ভাইদের কোন অসচ্ছতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

ইদাদ, একটি ভুলে যাওয়া ফরয। ডাউনলোড লিংক

https://www.pdf-archive.com/২০১৭/০৫/...tten-fardh.pdf

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪০৮

কেন আমি আল কায়দায় অংশগ্রহণ করলাম

(প্রথম পর্ব, ভূমিকা ও কারণ ১)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৫-২২-২০১৯

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله الهادي إلى الصواب، وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته إلى يوم الدين... أما بعد:

আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি নিজেই তার উপায়-উপকরণ তৈরি করে দেন। আমি কোনদিন কল্পনাও করতাম না যে,আমি আল কায়েদার সদস্য হবো। কারণ আল কায়েদা সম্পর্কে মিডিয়া যেমন ব্যাপকভাবে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালাচ্ছিল তেমনি কতিপয় আলেম ও তালিবুল ইলমও একই কাজে লিপ্ত হচ্ছিলো; যারা হয়ত সরকারী আলেম বা হকপন্থী আলেম, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের পদস্খলন হয়েছে। জনৈক কবির বক্তব্যে তাদের অবস্থার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে,

رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا

‘সে উপকার করতে চেয়েছে, কিন্তু অনিচ্ছায় ক্ষতি করে বসেছে। কিছু কিছু সদ্ব্যবহার দুর্ব্যবহারও হয়ে থাকে।’

অতঃপর যখন আমি ঐ মাসআলাগুলো নিয়ে গবেষণা করলাম_যার ব্যাপারে বিরোধীদের পক্ষ থেকে আল কায়েদার উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়_ তখন আমি দেখলাম ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আল কায়েদার কারো সাথে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বর্তমান ইজতিহাদী কিছু বিষয়ে তাদের মতভিন্নতা রয়েছে। আর ইজতিহাদী বিষয়ে মতভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক।

‘তাঈফায়ে মানসূরাহ’ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী আমি তাদের মাঝে অন্যদের তুলনায় অধিক পেয়েছি। ইসলামী দলসমূহের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে আমি তাদেরকে সর্বোত্তম পেয়েছি এবং আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমি একটি আদর্শ ইসলামী দল হিসেবে দেখেছি। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদগণ সবচে’ কঠিন ও অন্ধকার সময়ে সাহায্য বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ তারা ইসলামের সুরক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে। আমি দেখেছি, তারা আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাগূতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অন্যদের তুলনায় তারা মিল্লাতে ইবরাহীমকে বেশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। আমি যা বলছি এমনিতেই বলছি না। বিস্তারিত বর্ণনার সময় আশা করি আপনারও একই বোধ হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে দিয়েছে। আমি তাদের পথে চলে এতটাই সুখ ও শান্তি লাভ করেছি যা পূর্বে কখনো পাই নি। সুতরাং হে সম্মানিত আলেমগণ, হে তালিবুল ইলম ভাইগণ, আপনাদের ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের সহযোগিতা পরিত্যাগ করবেন না।

মুজাহিদদের প্রতি_বিশেষ করে আল কায়েদার প্রতি_সদয় হোন। তাদের থেকে আপনাদের দূরে থাকা বা অন্যকে দূরে রাখা তাগূত, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। আপনারা হয়ত তা টেরও পাবেন না। মুজাহিদদের ভুলগুলো ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিতে দেখুন এবং শরীয়তের নীতিমালার আলোকে তাদের ভুলগুলো যাচাই করুন, সূরা বাকারায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ রাদি.এর ‘সারিয়্যা’র ঘটনায় যেমনটি আপনারা পান এবং তাদের সাথে নববী আচরণ করুন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধে করেছিলেন এবং হযরত উসামা, খালিদ

রা. ও মক্কা-বিজয়ের পর ইসলামগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবাগণের সাথে হুনাইনের যুদ্ধে করেছিলেন। যদি আল কায়েদার একাধিক ভুল থেকে থাকে (তবে তাতে তেমন কোন সমস্য নেই।) কারণ জিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবাদের থেকেও অনেক ভুল বা পদস্খলন ঘটেছে। ভুল অবশ্যই অস্বীকার্য, কিন্তু এই ভুল সমস্ত কীর্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে না এবং এই ভুলের কারণে এতটা নিন্দা করা অনুচিত যে, তা শরীয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যায়।

(হে আলেম ও তালিবুল ইলমগণ,) যদি আপনারা আল কায়েদার ভুলগুলোর এতই নিন্দা করেন তাহলে আপনারা জিহাদ থেকে আপনাদের বসে থাকা, মুজাহিদদের সাহায্য না করা, আপনাদের কতিপয়ের তাগুতকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা, উম্মতকে জিহাদের শিক্ষা না দেওয়া এবং 'ইদাদ' ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা না করার কারণে কেন নিজেদের ভর্ৎসনা করেন না? সুতরাং আপনাদের ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, তাদের সাহায্য করা মানে ইসলামকেই সাহায্য করা এবং তাদের পরাজয় ইসলামেরই ক্ষতির কারণ হবে।

আমি জানি, অনেক বিরোধী তালিবুল ইলম এই মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত করেছে অন্যের অন্ধ অনুসরণে। তাদের অবশ্যই আরেকবার ভেবে দেখা উচিত তাদের আরোপিত আপত্তিগুলো নিয়ে।

আমি আল কায়েদার মানহাজকে গ্রহণ করেছি চল্লিশটি কারণে। আমি আল্লাহর কাছে তাওফিক ও ইখলাস প্রার্থনা করি এবং আশা করি যে, তিনি এই লেখাটি সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের পথপ্রদর্শক বানাবেন।

এই লেখাটি সকাল-সন্ধ্যায় তৈরি হয়ে যায়নি; বরং এটা দীর্ঘ গবেষণা, গভীর চিন্তাভাবনা ও দলিল খোঁজাখুঁজির ফল।

(হে মন,) কষ্ট করো, জীবন তো খুবই ছোট, আল্লাহর কাছেই তো হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং পথের বন্ধুরতা যেন তোমার মনে ভীতি সঞ্চার না করে। তাহলে তুমি নিন্দিত হবে এবং লজ্জায় পড়বে। সত্য তো স্পষ্ট এবং আলোকিত, মিথ্যা অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা সঠিক পথের উপর শান্তির পথকে প্রাধান্য দিয়েছে।

يُريدُ المَرءُ أن يُعطى مناهُ ويأبى الله إلا ما يشاء : وكلُّ شديدةٍ نزلت بقومٍ سيأتي بعد شدتِها رخاء

"মানুষ চায় তার ইচ্ছা পুরন হোক, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। যে সম্প্রদায়ের উপরই দুর্দশা আপতিত হয়েছে সেই দুর্দশার পর অবশ্যই সুখ আসে।"

যেই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করবো তা এমন নয় যে কেবল তাদের মাঝেই পাওয়া যাবে। কিন্তু গুণগুলোর সমন্বয় কেবল তাদের মাঝেই হয়েছে। সুতরাং হে পাঠক, আপনি ন্যায়বিচারক হন এবং দ্রুত সমালোচনা করতে যাবেন না; বরং পড়ুন ও চিন্তা করুন। এবং সতর্ক থাকুন এমন ব্যক্তিদের থেকে যারা কতিপয় বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা করে, অথচ কর্মক্ষেত্রে তার বিপরীত করে। জেনে রাখুন, রিজাল (মনীষী) দিয়ে সত্যকে চেনা যায় না, সত্য দিয়েই রিজাল (মনীষী) চিনতে হয়।

যদি এই চল্লিশটি কারণ আপনার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে নিজেকে অন্তত আরেকবার জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের প্রতি মন্দ আক্রমণাত্মক দৃষ্টিদানকারী হয়ে থাকলে আপনার আক্রমণকে লঘু করুন। জেনে রাখবেন, তারা এক মহান লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাদের কাছে তাদের পক্ষে এমন দলিল আছে যা অন্যদের কাছে নেই।

হে আল কায়েদার প্রতি তীর নিক্ষেপকারীগণ, এই পৃষ্ঠাগুলো সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে পড়ুন এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন যে, আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের তিরস্কার থেকে ইসলামের শত্রুরাই সর্বপ্রথম ফায়দা হাসিল করছে। আপনারা গোপন হস্তসমূহের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকুন।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

আপনাদের তালিবুল ইলম ভাই

আবু মুসআব আল-আওলাকী

জিলহজ্ব ১৪৩০হি.

১.কারণ তারা জিহাদের পথ অবলম্বন করেছে।

আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করেছি। কারণ তারা জিহাদের পথে চলেছে আর জিহাদই হল উম্মাহর লাঞ্ছনা দূরীকরণ এবং উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার একমাত্র শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা। এই সময় মুসলিম উম্মাহ একটি দুর্বলতার স্তর অতিক্রম করছে। ইসলামী দলগুলোও খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে। ইসলামী খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কর্মপন্থায় ভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন,

১. কেউ কেউ এমন একটি ইসলামী দলে যুক্ত হয়ে কাজ করাকে উত্তম মনে করছে, যারা কিতালের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে সমাজে প্রচলিত আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

২. কেউ কেউ বর্তমান শাসকদের ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও কুফরি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শরয়ী শাসক (খলীফা) মনে করে এবং তাদের আনুগত্য আবশ্যক জ্ঞান করে।

৩. কেউ কেউ শিক্ষা-দীক্ষাকে অগ্রগণ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য করছে।

৪. কেউ কেউ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সেবামূলক সংস্থা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে উত্তম মনে করছে।

কিন্তু আল কায়েদা মনে করে, উম্মাহর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হল আল্লাহর রাস্তায় 'জিহাদ' করা। আর এটাই হচ্ছে শরয়ী পদ্ধতি যে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলআইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

'যখন তোমরা 'ঈনাহ' নামক সুদের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়বে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন; যা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত

দূর করবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে (জিহাদে) ফিরে আস।' (আবু দাউদ)

সুতরাং জিহাদই হল একমাত্র চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ*وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো; আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন,তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,প্রজ্ঞাময়। (তাওবা, আয়াত ১৪ ও ১৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর হয় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)। (সূরা আনফাল, ৩৯)

আল কায়েদা আমাদের মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও জিহাদ মনে করে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولا تنازعوا الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان.

তোমরা শাসকদের আনুগত্য পরিত্যাগ কর না, তবে যদি তোমরা এমন প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে (তবে তার আনুগত্য পরিত্যাগ করো)। (বুখারী ও মুসলিম) সুতরাং এই বিষয়টির সমাধানের জন্য কোন ব্যাখ্যা বা দর্শনের প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ শুধু জিহাদের পথে চলা, যাতে এই উম্মাহ থেকে লাঞ্ছনা দূরীভূত হয় এবং আমরা পরপিূর্ণভাবে কাফের ও মুরতাদদের থেকে মুক্ত হতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয় জানেন যে, মানবরচিত আইন কুফর। আল্লাহ বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করে যাও যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯) কিন্তু এখন দ্বীন পুরোটা আল্লাহর হয়ে যায় নি এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله

যদি দ্বীন কিছু আল্লাহর হয় আর কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হয় তবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ৫/৫৩৪)

হে মুসলিম ভাই, তুমি কি চাও যে, আমেরিকান ট্যাংকে চড়ে আফগানিস্তানে আসা কোন ব্যক্তি মুসলমান হোক? তুমি কি কাউকে ইরাকবাসীদের জিহাদ ছেড়ে ভোটাভুটির প্রতি আহ্বান করার অনুমতি দিবে? তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে, যে এমন দুই ব্যক্তির হুকুমের মাঝে কোন পার্থক্য করে না, যাদের একজন কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে ফয়সালা করে না আর অপরজন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না? ফলে সে এখনকান শাসকদের_যারা শরীয়তকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে_বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের শাসকদের সাথে তুলনা করে_যারা শরীয়ত দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সৈন্য প্রেরণ করতো, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মানত না।

আল কায়েদা জিহাদের পথে চলেছে, আর যারা জিহাদের পথে চলে বিরোধীরা কিংবা সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হও তবে তোমার দ্বিধা ছেড়ে এই কুরআনী আয়াতগুলো অনুসরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সম্মানের সাথে একটু চিন্তা করে পড় এবং

মানুষের কথাবার্তার প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করো না; যদিও তারা চমকপ্রদ কথা বলে। আল্লাহ বলেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যই দায়ী করা হবে আর মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর, আশা করা যায় আল্লাহ কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। (নিসা, আয়াত:৮৪)

কেউ যদি বলে, 'যুদ্ধ করে যদি কোন ফায়দা হয় এবং কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করা যায় তবেই আমরা যুদ্ধ করবো; আর যদি কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করা না যায় তাহলে আমরা যুদ্ধ করবো না।' তার প্রতিউত্তরে আমরা বলবো, আজকের যুদ্ধে কাফেরদের শক্তি প্রতিহত হবে কি হবে না এটা কে নির্ধারণ করে দিবে? উত্তর হবে, মুজাহিদগণই নির্ধারণ করে দিবে; কেননা তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে সবচে' বেশি অবহিত, আর তারাই তো যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করেছে। কাফিরদরে শক্তি সম্পর্কে এমন ব্যক্তি কিন্তু কিছুই জানাতে পারবে না যে কাফেরদের শক্তিকে বড় করে দেখে এবং যুদ্ধে যায় না; বরং কখনো কাফেরদের শক্তি বর্ধনে কুচক্রী মিথ্যাবাদী মিডিয়ার দ্বারা প্রতারিত হয়। মোটকথা, মুজাহিদগণই এই বিষয় সবচে' বেশি অবহিত। তাই তো আমরা দেখতে পাই, তারা আফগানিস্তান, ইরাক ও আন্যান্য জায়গায় বিজয় লাভ করছেন এবং কুফরী শক্তগুলো পরাজিত হচ্ছে। অনুগ্রহ ও কৃপা তো আল্লাহরই।

(আলেমদের প্রতি একটি পরামর্শ : আলেমগণ চিকিৎসা বা আন্য কোন বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে যেমন ঐ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে থাকেন তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রেও মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করা উচিৎ। কারণ জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদদেরে অভিমতটাই সঠিক হয়। কেননা তারা ময়দানের বিষয়াবলীতে অভিজ্ঞ।)

পরবর্তী পর্বগুলোও অতি শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... আপনাদের নেক দোআয় ভুলবেন না...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৫৫

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(দ্বিতীয় পর্ব, কারণ ২ ও ৩)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৫-২৩-২০১৯

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

২. কারণ সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সাহায্য পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ এসে যায় এবং তারা এ অবস্থায়ই থাকে। (মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এই হাদীসটি কি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুরতাদদের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছে এবং তাদের সাথে তরবারির সম্পর্ক স্থাপন করেছে, ফলে কখনো সে আক্রমণ করে সফল হয়েছে, কখনো শত্রুরা সফল হয়েছে?

এই হাদীসটি কি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে এমন সময় যখন মসজিদগুলো ধ্বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, কুরআন শরীফের

কপিগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করা হচ্ছে, মুসলিমদের সম্মান হরণ করা হচ্ছে, নিগ্রো রাফেদীরা মুসলমিদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠতি করছে এবং কুফর ইসলামের উপর বিজয়ী হয়ে আছে?

এই হাদীসটি কি এমন লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না- যারা রাফেদী ও ক্রুশ-পূজারীদের দ্বারা উম্মাহর ধর্ষিতা মা-বোনদের আর্তচিৎকার শুনে বলেছে, 'আমাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে না, আমাদের চোখ মুদিত হবে না, আমাদের তরবারি কোষবদ্ধ হবে না যতক্ষণ না আমরা তোমাদের সম্মানের প্রতিশোধ গ্রহণ করব।' এবং তাদের কথা কাজে পরিণত করেছে? বলুন, এই হাদীসটি কি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি হবে না?

হে ভাই, আপনিই বলুন, তাঈফায়ে মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী কি উল্লিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা ইরাকের জিহাদকে অবৈধ মনে করে এবং এই জিহাদকে ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে? সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলী কি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা মুজাহিদদের সাহায্য ছেড়ে দিয়ে নিজ বাড়িতে বসে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত? কিংবা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- যারা মুজাহিদদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে এবং মুজাহিদদের সম্বন্ধে অযথা বিষোদগার করে, যারা মুজাহিদদের ভুল ধরার জন্য ওত পেতে থাকে, কোন কিছু পেলেই তা ছড়িয়ে দেয় এবং মুজাহিদদের উত্তম ও সুন্দর গুণাবলী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে? আপনিই বিচার করুন, কার ক্ষেত্রে হাদিসটি প্রযোজ্য হবে! বিষয়টির জন্য আপনাকে দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন পড়বে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাদের সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' আপনিই বলুন, তাদের সাহায্য পরিত্যাগ কে করলো? কাফেরের মুকাবেলায় থাকা মুজাহিদগণ নাকি জিহাদ ছেড়ে নিজ বাড়িতে বসে থাকা ব্যক্তিরা? বিচারের দায়িত্ব পাঠকের কাছেই।

আপনি যদি এটা বিশ্বাস করে থাকেন যে, মুজাহিদগণ তঈফায়ে মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের গুণাবলীর যোগ্য অধিকারী তবে ভুল হবে না। কারণ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর যুগের শামের মুজাহিদগণকে তাঈফায়ে মানসূরাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যে সকল ইসলামী দল আল কায়েদা ও অন্যান্য মুজাহিদগণকে ভুল বা ভ্রান্ত বলতে চান আমি তাদের প্রশ্ন করবো, 'আমাদের এমন মুজাহিদ দেখান যারা আপনাদের পথে চলে এবং আপনাদের মানহাজ অনুসরণ করে।' -তারা এমন মুজাহিদ বিশ্বের কোন জিহাদ-ভূমিতেই দেখাতে পারবে না।- তাহলে কিভাবে আপনারা জিহাদ ছাড়া থাকতে পারেন, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে? নাকি আপনারা অন্যকিছু বলবেন?? আপনাদের হিসাব ফিরে দেখার সময় কি এখনো হয় নি? ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণরত মুজাহিদদের সম্বন্ধে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করুন।

৩. কারণ তাদের ও অন্যান্য মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে তঈফায়ে মানসূরাহ-এর এই গুণটি প্রযোজ্য হয় যে, তারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করবে।

'উকবা ইবনে 'আমির রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله ﷺ يقول:"لا تزال عصابة من أُمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك"

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের উপর লড়াই করে যাবে, তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত করবে, তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এ অবস্থায়ই থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়। (মুসলিম)

এই হাদীসটি তাদের একটি গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। তা হল সত্যের জন্য যুদ্ধ করা। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে, আল কায়েদা হল সত্যের পক্ষে যুদ্ধরত শক্তিশালী দলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর প্রমাণ হল ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও সোমালিয়ায় আশ-শাবাব কর্তৃক তাদের চলমান যুদ্ধ। তাছাড়া আরব উপদ্বীপ ও মাগরিবে মুরতাদ শাসকদের সাথে তাদের যুদ্ধও একই প্রমাণ বহন করে। এই বর্ণনাটি একেবারেই স্পষ্ট। মুজাহিগণই এই গুণের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত। তাদের ক্ষেত্রেই এই হাদীস প্রযোজ্য হবে। এই হাদীসটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং জিহাদকে ভুলে থাকার ভান করেছে; বরং তাদের অনেকে তো জিহাদ থেকে বিমুখতা

প্রদর্শন করে এবং উপায়-উপকরণের স্বল্পতার ওজর দেখিয়ে নৈরাশ্য ছড়িয়ে বেড়ায়।

উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাপারে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়; কতিপয় ইসলামী দল এই হাদীসটি বর্ণনা করতে অনীহা প্রকাশ করে এবং কতিপয় বিজ্ঞ আলেমও এই হাদীস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আমরা অনেক শায়েখ থেকে এই হাদীসটি শুনেছি। তারা পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন, শুধু 'তারা কিতাল করবে' এই অংশটুকু বাদ দেন, যেন মুসলিম শরীফে এর অস্তিত্বই নেই। একসময় আমি উত্তর ইয়েমেনে পড়ালেখা করতাম। একদিন আমার এক সহপাঠী মুসলিম শরীফ খুলে এই হাদীসটি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের শায়েখগণ এই অংশটুকু বর্ণনা করেন না কেন?! আমি তখন কোন উত্তর দিতে পারিনি। সুতরাং হে ভাই, এটি একটি কঠিন গুণ; কেবল এর যোগ্য ব্যক্তিই এর দাবী করতে পারে। আল্লাহর রহমত যে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يقاتلون** বলেছেন, যাতে কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **يجاهدون** (তারা জিহাদ করে) বলতেন তাহলে কেউ কেউ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিত। এতদাসত্ত্বেও কতিপয় প্রবৃত্তিপূজারী এ শব্দের অর্থ বিকৃতি করে অন্য অর্থ নেয়ার হীনপ্রয়াস পায়। (নাউজুবিল্লাহ।) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আমাদের আল কায়েদার এক সাথী আমাকে বলেছে যে, একবার সে অন্য দলের এক সাথীর সাথে আলোচনা করছিল। এক পর্যায়ে সে বলল, আমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **يقاتلون**'তারা লড়াই করবে।' তখন ঐ লোকটি বললো, **يقاتلون** এখানে **يدعون** 'তারা দাওয়াতের কাজ করবে' অর্থে এসেছে। তখন আল কায়েদার ভাই বলল, যদি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন যে, অভিধানে **يقاتلون** অর্থ **يدعون** 'তারা দাওয়াতের কাজ করবে' তাহলে আমি আল কায়েদার মানহাজ ছেড়ে দিবো। দেখুন, তারা এই স্পষ্ট হাদীসগুলো অর্থ বিকৃত করছে কেবল এ কারণে যে, এর বাহ্য অর্থ তাদের পক্ষে যায় না। সুতরাং এই পথ তথা জিহাদের পথই হলো সত্যের পথ। এই পথের কাঠিন্য আপনার কোন ক্ষতি করবে না। কেননা কিতালই তঈফায়ে মানসূরাহর অন্যতম গুণ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৬৯

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৩য় পর্ব- কারণ ৪ ও ৫)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৫-২৪-২০১৯

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

৪. কারণ তারা গুরাবা; ইসলামের অজ্ঞাত অপরিচিতি রক্ষক

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء

ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় বিকাশ লাভ করেছে, অচিরেই আবার অপরিচিত হয়ে যাবে; সুসংবাদ গুরাবাদের (অপরিচিতদের) জন্য! (ইবনে মাজাহ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

এই হাদীসটি বর্ণনা করছে যে, আহলে হক্ব বা সত্যপন্থীরা অপরিচিত থাকবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি নিজ আকীদা ও জিহাদের কারণে মৃত্যুভয়ে জীবন কাটায় সে-ই প্রকৃত অপরিচিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করে। সে-ই অপরিচিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করে, কারণ মানুষ তাকে অপবাদ দেয় যে, তার আকীদা সংশয়পূর্ণ। সে অপরিচিত থাকে, কারণ সে সাহায্যকারীর স্বল্পতার কালেও

সত্যের উপর থাকতে চায়; সে-ই প্রকৃত গরীব তথা অপরিচিত। সে জীবন যাপন করে শংকিত অবস্থায়, তার মোবাইল ফোনটিও গোয়েন্দার মতো তার যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। সে তার গাড়ি মাইন বোমার দ্বারা বিস্ফোরিত হওয়ার শংকায় থাকে। সে স্বাধীনভাবে শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতে পারে না, কারণ প্রশাসন তার জন্য ওত পেতে থাকে। নিজ গোত্রের অধিকাংশই তার শত্রু হয়ে যায়, বরং তার পরিবার থেকেও কখনো শত্রুতার রোষানল নিক্ষিপ্ত হয় তার প্রতি। তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তার আকীদা সত্য থেকে বিচ্যুত বা সে শান্তি বিনষ্টকারী এবং অনিষ্টের দ্বার উন্মোচনকারী; কিংবা বলা হয় যে, সে পরিকল্পনাহীন কর্মে লিপ্ত। এজাতীয় আরো কত নিন্দাবাক্য তেড়ে আসে তার প্রতি তার ইয়ত্তা নেই! এ ব্যক্তিকেই যে 'অপরিচিত বা গরীব' বলা যায় এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহুদী, খ্রিস্টান ও তাগুতদের জুলুমের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে তাগুতদের সম্বন্ধে বলে, 'এরা আমাদের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আমীর বা 'ওলাতুল উমূর' যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম।' এবং কোনদিন সে আল্লাহর রাস্তায় কাটায় নি, তাগুতদের অনিষ্ট থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে; যেথায় ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো অর্থনৈতিক সংকটেও পড়েও না- এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত 'গরীব বা অপরিচিত' গুণটি প্রযোজ্য হবে না। কিভাবে আমরা এমন ব্যক্তিকে 'অপরিচিত' বলতে পারি, অথচ সে 'অপরিচিতি'র কোন স্তরই অতিক্রম করে নি; বরং সে কখনো তাগুত কর্তৃক সম্মানিত হয় এবং তার জন্য এমন কিছু বিষয় খুব সহজেই প্রস্তুত থাকে যা অন্যদের জন্য থাকে না। কতিপয় দায়ীর অবস্থা এমন যে, তার জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ তার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, তার জন্য উত্তম গাড়ির ব্যবস্থা থাকে; তাকে কোন কষ্টের শিকার হতে হয় না, তার জেলে যাওয়ার ভয় থাকে না, গোয়েন্দার নজরে পড়ার আশংকা থাকে না। অথচ একই সময়ে অন্যরা এসকল ভোগসমগ্রী থেকে বঞ্চিত, মাতাপিতা, স্ত্রী-সন্তান, স্বদেশভূমি ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শুধু এই ইসলামের কারণেই। সুতরাং কত পার্থক্য এ দুই ব্যক্তির মাঝে! কত ব্যবধান এ দুই ব্যক্তির ইসলাম অনুসরণের মাঝে!

এটা কোন বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা নয়, বরং আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা এমন যামানায় আছি যখন ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা ইসলামী দেশগুলোর উপর আক্রমণ

করছে আর তাগুতরা পেট্রোল, খাদ্যদ্রব্য, গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছে, তাদের জন্য আকাশপথ, স্থলপথ ও সমুদ্রপথ খুলে দিয়েছে এবং মুজাহিদদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাঁধা দিচ্ছে। আমরা এমন এক যামানায় আছি যখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মানবরচিত কুফরী আইন দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে তাগুতের বিরোধিতা করবে সে-ই অপরিচিতির জীবন যাপন করবে। আর যে কাফেরদের সঙ্গ দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করবে কিংবা মৌনতা অবলম্বন করবে সে অপরিচিত নয়; যদিও ইসলামের জন্য তার অনেক খেদমত রয়েছে। কেননা মুজাহিদগণই 'যারা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখবে' এই হাদিসের যোগ্যপাত্র।

প্রিয় ভাই, আপনি একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্বের ইসলামী দলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত এই গুণটির অধিক নিকটবর্তী। একটু ভেবে দেখুন। এই হাদীসটিও 'অপরিচিতি'র হাদীসের সমার্থক। মুজাহিদগণের শত্রুরা অধিক শক্তিশালী, কিন্তু তাদের সাহায্যকারী খুবই অল্প। ইহুদী-খ্রিস্টান, তাগুত ও তাদের দোসররা এবং সরকারী আলেমরা তাদের শত্রু। কিছু ভুল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কতিপয় সত্যপন্থী আলেমের রূঢ় আচরণ থেকেও তারা নিরাপদ থাকে নি। তাদের সঙ্গ দিয়েছে কেবল কতিপয় হক্কপন্থী আলেম এবং 'দ্বীনি ফিতরত' ধারণকারী কতিপয় মুমিন বান্দা। কিন্তু অধিকাংশ মুমিনরাই মুজাহিদদের দিকে নিন্দনীয় দৃষ্টিতে তাকায়, তাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে। এটা হয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টান ও দরবারী আলেমদের অনুগামী ভ্রান্ত মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণার কারণে। মিথ্যাবাদী মিডিয়াগুলো মুজাহিদদের নামে এমন কত মিথ্যা রিপোর্ট করেছে যা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্দোষ! তারা মুজাহিদদের বিজয়গুলো এবং কাফেরদের পরাজয়গুলো কত লুকিয়ছে! তাদের এই মিথ্যা প্রচারণা কতিপয় সত্যপন্থীকেও ধোঁকা দিয়েছে। (এই বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। এটা আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়।)

প্রিয় ভাই, আপনি ঐ মুজাহিদের প্রতি লক্ষ্য করুন, যে নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দিয়েছে এবং আল্লহর মর্যাদার বিষয়সমূহ সম্মানহানী হতে দেখে সে আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, আল্লাহর জন্য নিজের জীবনের নযরানা মেনেছে,

দুনিয়ার ভোগসামগ্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ফলে তার ভাগ্যে জুটেছে শান্তির পর ভয়, সচ্ছলতার পর দারিদ্র্য, আল্লাহর ভূমিতে শান্তিপূর্ণ বিচরণের পর বয়কট। এতদাসত্ত্বেও তার প্রতি অপবাদের অন্ত নেই! তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তার আকীদা সংশয়পূর্ণ, সে হিকমাহ বুঝে না এবং সে উম্মাহর ক্ষতি ডেকে আনছে। স্বীয় দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার কারণে সে কি অন্যদের তুলনায় অধিক কষ্টের সাথে হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণ করে আছে না?? আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

'মানুষ কি মনে করেছে যে, 'ঈমান এনেছি' একথা বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরে পরীক্ষা করা হবে না?' (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২)

মুজাহিদগণ এখন পরীক্ষার সম্মুখীন। সন্দেহ নেই, সত্যাশ্রয়ীরা অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। কেননা সর্বত্রই ইহুদি-খ্রিস্টান ও তাদের মুনাফিক দোসরদের কর্তৃত্ব চলছে এবং তারা মুসলিম দেশগুলো শাসন করছে। সুতরাং হলফ করেই বলা যায় যে, একজন সত্যাশ্রয়ী কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে থাকতে পারে না। কারণ কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সময় যে ব্যক্তিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর অটল থাকার ইচ্ছা পোষণ করবে অবশ্যই সে কাফেরদের থেকে কঠোর নির্যাতনের শিকার হবে। তো এমন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েও 'সাহায্যপ্রাপ্ত দলে'র অন্তর্ভুক্তির দাবীকারীকে আমি বলবো, হয়ত আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর থাকবেন, তখন অবশ্যই আপনাকে কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হতে হবে; নয়ত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে) পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবেন। সুতরাং আপনি আপনার অনুসৃত পথ ও পন্থাটাকে আরেকবার দেখে নিন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। যে কোন দল যদি তার যাত্রাপথে বাঁধা বা পরীক্ষার সম্মুখীন না হয় তাহলে অবশ্যই তাদের নিজেদের কর্মপদ্ধতিটা পুনরায় যাচাই করে দেখা উচিৎ। সায়্যিদ কুতুব রহ. এ উপদেশই দিয়ে গেছেন।

৫. কারণ তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অগ্রগামী

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের আদেশ দিয়ে বলেন,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

'কে মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে বিমুখ হতে পারে নির্বোধ ছাড়া?' (বাকারা, আয়াত ১৩০)

সুতরাং যে ব্যক্তিই মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে বিমুখ হবে এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধিতা করবে সেই নির্বোধ সাব্যস্ত হবে। প্রকৃত মুমিন তো সর্বাবস্থায় শরীয়তের অনুসারী হবে। শরীয়ত যদি তার জ্ঞানবিরোধী হয় তবে তার জ্ঞানই অভিযুক্ত হবে। তো আমরা কোন প্রকার কদাকার যুক্তি এবং বুদ্ধিহীন বিবেকের আশ্রয় না নিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আল কায়েদা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। মিল্লাতে ইবরাহীম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর আপনিই বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আল্লাহর একটি বাণীর প্রতি লক্ষ করুন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে; যখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল; যদি না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (মুমতাহিনা, আয়াত : ৪)

উক্ত আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে আদর্শের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হল, দুর্বল অবস্থাতেও কাফের-মুশরিক ও তাদের উপাসনা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া। কতিপয় আলেম বলেন, এটাই হল মা'বুদ বা উপাস্যের পূর্বে 'আবেদ' তথা উপাসনাকারীদের

থেকে সম্পর্কচ্ছেদ। কারণ মানুষ কখনো বাতিল উপাস্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অন্য কোন অজুহাতে উপাসনাকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। এমন করলে সে পরিপূর্ণ মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হবে না; যতক্ষণ না উপাসনাকারীদের থেকেও সম্পর্কচ্ছেদ করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, তাঁরা শুধু সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, বরং এটাও বলে দিলেন যে, **"كَفَرْنَا بِكُمْ"** (আমরা তোমাদের মানি না) যাতে আল্লাহর বন্ধু ও শত্রুদের মাঝে পার্থক্যটা পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরের আয়াতে 'শত্রুতা'কে 'বিদ্বেষের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ শত্রুতাটা প্রকাশ্যে হয়ে থাকে আর বিদ্বেষ অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। তাছাড়া তাদের সাথে শত্রুতাটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ না তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। হে ভাই, এবার আপনিই চিন্তা করে দেখুন, আল কায়েদা এই আদর্শকে কতটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.. আপনাদের নেক দোআয় ভুলবেন না...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৭৭

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৪র্থ পর্ব, কারণ-৬)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৫-২৬-২০১৯

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

৬. মিল্লাতে ইবরাহীম হলো কাফেরদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া।

কাফের মুরতাদদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোর নাম উল্লেখ করলে আল কায়েদার নামই সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, কতিপয় ইসলামী দল স্পষ্টভাবে মানবরচিত আইনকে কুফরী মনে করে, কিন্তু মানবরচিত আইন দ্বারা যারা বিচারকার্য পরিচালনা করে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। বিষয়টি তো এমন হলো যে, 'কুফরকে তো অস্বীকার করি, কিন্তু কাফেরকে অস্বীকার করি না।' কেউ বলতে পারে যে, তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম হয়নি। আচ্ছা, হুজ্জত কি স্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে কায়েম হয় নাকি অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে? শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, 'আর তিনি হুজ্জত কায়েম হওয়ার কথা বলেছেন অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য মাসআলার ক্ষেত্রে, আর এমনটি বলা হয়ে থাকে অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রেই।' আর হুজ্জত কায়েম হওয়ার অর্থ আসলে কী? এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করার জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বাণী লক্ষ্য করুন। শাইখুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়া রহ. মানতিকীদের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূলদের সম্বন্ধে আল্লাহর হুজ্জহ মানুষের উপলব্ধি শক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর হুজ্জত কায়েমের জন্য আহুতদের অবগতি শর্ত নয়। একারণেই কুরআন শ্রবণ ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকে কাফেরদের বিমুখতা তাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত কায়েমে প্রতিবন্ধক হয়নি। এমনিভাবে নবীগণের ঘটনাবলী ও তাদের উপদেশাবলী থেকে তাদের পরাঙ্মুখতা তাদের উপর মহান আল্লাহ তাআলার হুজ্জত কায়েমে বাধা সৃষ্টি করবে না। কারণ তাদের উপলব্ধি শক্তি রয়েছে।' এখন আপনি কুয়েতের সংবিধানের একটি কানূনের প্রতি লক্ষ্য করুন: 'যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট কোন আইন না থেকে থাকে তাহলে বিচারক সমাজের প্রচলন অনুযায়ী বিচার করবে। সে বিষয়ে যদি কোন প্রচলন না থেকে থাকে তাহলে বিচারকইসলামী ফিকহের সাহায্য নিয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের রায় মতো বিচার করবে।' (কাশফুন নিকাব 'আন শরীআতিল গাব) আপনিই বলুন, এসবের পরও এই সকল মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারীদের কুফরির ব্যাপারে কি সন্দেহ কিংবা দ্বিধা থাকতে পারে? মিল্লাতে ইবরাহীম হল কাফেরদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষের ঘোষণা দেয়া। আল কায়েদা ইহুদী-খ্রীস্টান ও মুনাফিকদের সাথে শত্রুতায় ঘোরতর। তারা ঐ ব্যক্তির মতো নয় যে দুর্বলতার অযুহাতে নিজ আকীদা ও বিশ্বাস গোপন করে রাখে। তার উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকু বলবো, দুর্বলতার অযুহাতে কিভাবে তুমি তাগুতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টিকে গোপন করে রাখছো? অথচ তুমি মক্কীজীবন থেকেও শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছো! তো হয়ত তুমি পরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না এবং তা তোমার দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে; কিংবা তুমি শরীয়ত মানতে গিয়ে লাভ-লোকসানকে বিবেচনাধীন রাখবে, তখন তো রসূলুল্লাহর অনুসৃত মিল্লাতে ইবরাহীমের বিপরীতে গিয়ে তোমার 'লাভ-লোকসানের' কোনই মূল্য থাকবে না। সুতরাং নিম্নোক্ত দুই কাজের কোন একটি অবশ্যই করতে হবে,

১. যে বিষয়টির ঘোষণা অবশ্যই প্রকাশ্যে দিতে হবে_যদিও দুর্বল ও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা হয়; তা হল প্রকাশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেয়া, গায়রুল্লাহর উপাসনাকে অস্বীকার করা, মানবরচিত সংবিধান, গণতন্ত্র থেকে বিরত থাকা এবং এর দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও কাফের-মুশরিকদের সাহায্য না করা।

২. কিছু বিষয় গোপনে করা, যেমন ইসলামী স্বার্থে কিছু গোপন বৈঠক করা, জিহাদের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জিহাদপ্রেমী লোক জোগাড় করা ইত্যাদি। আল কায়েদা তাগুতদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়ে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। আচ্ছা, কে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অগ্রগামী: আল কায়েদা নাকি যারা তাগুতদের কুফরির বিষয়টি স্পষ্ট জেনেও তাদের সাথে নম্র আচরণ করে, মানুষের কাছে বলে বেড়ায় যে, তারা কুফরি করেনি এবং তারা ইসলমের উপর বহাল আছে; কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বলে যে, এই তাগুতরা ইসলামও প্রকাশ করে না এবং কুফরিও গোপন করে না (অর্থাৎ তারা প্রকাশ্য কাফির, মুনাফিক নয়)? আল কায়েদা সর্বপ্রকার কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেছে, **كفرنابكم** আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আল কায়েদা এটা করেছে যখন অনেক ইসলামী দল 'হিকমতের' আশ্রয় নিয়ে মুরতাদদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে কিংবা করে নি। কতিপয় ইসলামী দল তো এই মুরতাদদের মুরতাদই মনে করে না, বরং তাদেরকে আমাদের শরয়ী শাসক মনে করে, যাদের আনুগত্য আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক; অথচ তারা জানে যে, এই মুরতাদ শাসকেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে। এতদসত্ত্বেও কতিপয় ইসলামী দল মনে করে যে, কোন কোন অঞ্চলে কতিপয় শাসক শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করছে। আচ্ছা, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা, দুর্বলের উপর হদ প্রয়োগ করা, সবলকে ছেড়ে দেয়া, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও জিহাদের আভাস পাওয়া যায় এমন যে কোন বিপ্লব বন্ধ করার চেষ্টা করা; এর নামই কি শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা নাকি এ বিষয়গুলো ঐ দলের ব্যক্তিবর্গের চোখে পড়ে না!? আল কায়েদা ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাদের মুরতাদ সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। পূর্বের চীন থেকে পশ্চিমের আন্দালুস পর্যন্ত ইসলামী খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের দীর্ঘ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছে। কাফের রাষ্ট্রগুলো বিজিত হওয়া পর্যন্ত তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং যারা এমন ঘোষণা দেয় মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে অবশ্যই তারা মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের চেয়ে অগ্রগামী। কারণ ইখওয়ান ওবামাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা রাষ্ট্র পরিচালনার সময় অবশ্যই আমেরিকার স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখবে। সুতরাং কাফেরদের সাথে

আল কায়েদার মতো এমন প্রকাশ্য শত্রুতা আর কেউ করতে পারে নি। কেউ বলতে পারে, আল কায়েদা ছাড়া অন্যান্য অনেক মুসলিমও তো কাফিরদের সাথে শত্রুতার বিষয়টি প্রকাশ করেছে! তো তার উত্তরে আমরা বলবো, হ্যাঁ, কিন্তু তাদের এ প্রকাশটা কি আল কায়েদার মতো হয়েছে? উত্তর হবে, না; আমেরিকান শত্রুরাও সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিমদের মধ্যে তারা সবচে' বেশি যাদের আক্রোশের শিকার হয় তারা হল আল কায়েদা। ওবামা মিসরে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তার সর্বশেষ বক্তব্যে এটা অকপটে স্বীকার করেছে। তেমনিভাবে মুরতাদ শাসকেরাও মুসলিম দলগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি যেই দলটির আক্রোশের শিকার ও যাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত তারা হল আল কায়েদা। সত্য তো সেটাই শত্রুরা যা সাক্ষ্য দেয়। মিল্লাতে ইবরাহীম হল কাফেররা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা। তো যদি আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মপন্থার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই, যখন তারা খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার মনস্থ করলো তখন সর্বপ্রথম তারা জিহাদী কার্যক্রমকেই গ্রহণ করলো বা জিহাদকেই খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার মাধ্যম বানালো। কিন্তু তারপর তারা পর্যায়ক্রমে তা ছেড়ে দিতে থাকে। এরপর যদি আমরা সালাফী 'সারূরী'দের (যারা এসকল মাসআলার মূলনীতি প্রণেতা।) কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই, কিছুদিন পূর্বেও তারা স্পষ্টভাবে জিহাদের পক্ষে ছিল এবং তাগুতের বিরুদ্ধে যাবতীয় বিধি-বিধানও তারা প্রয়োগ করত। কিন্তু ৯/১১ এর মোবারক হামলার পর তাদের কতিপয়ের দৃষ্টিভঙ্গি যে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো! অবশ্য তাদের সবাই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় নি। কিন্তু আল কায়েদা সেই সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কাফেরদের একই কথা বলে আসছে, **كفرنابكم** আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম, আমাদের ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেলো যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে এই আদর্শের উপর দৃঢ়তা ও অবিচলতা কামনা করি। আমরা এ পথ থেকে বিচ্যুত হতে চাই না। কারণ যারা জিহাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি ও সতর্কবাণী। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৯)

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, এই যামানায় মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর চলতে হলে অবশ্যই আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে এবং কষ্ট সহ্য করায় অভ্যস্ত হতে হবে। কারণ মিল্লাতে ইবরাহীমের যথার্থ অনুসারী হতে হলে অবশ্যই অনেক বিপদ-আপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। যে ব্যক্তি কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয় না সে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হতে পারে না। কেউ কেউ এই বিষয় থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং সমাজ পরিবর্তনের অক্ষমতার অযুহাতে মিল্লাতে ইবরাহীমকে গোপন করে রাখে;তো আমরা তাকে বলতে চাই আমাদের সক্ষমতা দুই দিক দিয়ে হতে পারে,

১. বয়ানের সক্ষমতা অর্থাৎ মানুষকে বিষয়টি বোঝানো।

২. সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা।

যদি আমরা মানুষের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করে বুঝাতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এটাই করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা সাথে এটাকে আমরা শর্তযুক্ত করে দিতে চাই না; অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তন করতে পারব না বলে মানুষের কাছে বয়ানও করলাম না, মানুষকে এ সম্পর্কে কিছুই বললাম না- এমনটি আমরা করবো না, বরং বয়ান তো স্বতন্ত্র ইবাদত। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ থেকে এটাই আমরা বুঝতে পারি। নবী জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবন কতটা অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে পার করেছেন, পুরো কুরাইশ ছিল তার বিরুদ্ধে, তিনি ছিলেন একা সহায়-সম্বলহীন। সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা তার ছিল না; তবুও তিনি কাফেরদের সাথে কোন সমাঝোতা করেননি। কাফেরদের থেকে তিনি যেমন সম্পর্কহীনতার ঘোষণা

দিয়েছেন তেমনি তাদের উপাসনা থেকেও দায়মুক্ত হয়েছেন ও সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন, বয়ান করতে করতেই সমাজ পরিবর্তনের সক্ষমতা অর্জিত হবে এবং কিছু কাল পর্যন্ত বয়ানকারীদেরও এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। হজরত সুমাইয়া, ইয়াসির রাযি. ও অন্যান্য সাহাবাদের নির্যাতনের ঘটনা সবারই জানা।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... আপনার নেক দুআয় ভুলবেন না....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৮৮

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৫ম পর্ব, কবরণ-৭, ৮, ৯)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৬-০২-২০১৯

মূল:

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর:

আবু হামযা আল হিন্দী

৭. কারণ তারা বিজয় অর্জনের জন্য শরয়ী নির্দেশনা ও জাগতিক উপায়-উপকরণ দুটোই গ্রহণ করেছে

আল্লাহর যমীন থেকে ঔপনিবেশিক ও মুরতাদদের বিতাড়িত করে আল্লাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করে বিজয় অর্জন এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন নাজিল হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেমনি শরয়ী নির্দেশনার অনুসরণ করতে হবে তেমনি জাগতিক নীতিমালাও অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং দলীল-প্রমাণের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি তীর-তরবারিরও সমান গুরুত্ব রয়েছে।

তাদের শরয়ী নির্দেশনার অনুসরণ: জিহাদ সম্বন্ধে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই তারা ময়দানে নেমেছে। তারা জানে জিহাদ কখন বৈধ, জিহাদের ফজিলত কী, মানুষের অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপনের গুরুত্ব কতটুকু তারা এসব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেই এই কঠিন সময়েও আল্লাহর আদেশ পালনার্থে জিহাদে বেরিয়েছে। জিহাদে বের হওয়াই তাদের প্রধান কর্তব্য। কারণ মহান আল্লাহই তাদেরকে বের হতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনের প্রতি ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ অতি সামান্য। (তাওবা, আয়াত: ৩৮)

তাই আমরা দেখতে পাই যে, তাদের বিচারক ও দায়িত্বশীলগণ স্বশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি কার্যত জিহাদে অংশগ্রহণ করে জিহাদী মাসায়েল সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, যা জিহাদ না করা অনেক আলেমেরও জানা থাকে না। আমি শুনেছি ইবনে উসাইমীন রহ. অনেক জিহাদী মাসআলায় শায়েখ উসামা রহ. এর শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। অথচ এ দু'জনের ইলমের মাঝে কত বিস্তর ব্যবধান তা সবারই জানা। অনেক আলেম আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা জিহাদের পথে আসার পর আল্লাহ তাদের এমন ইলম ও জ্ঞান দান করেছেন যা তাদের পূর্বে ছিল না। এ পথে আসার পর এমন অনেক মাসআলা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যা তাদের নিকট পূর্বে অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং বলাই বাহুল্য, জিহাদের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুজাহিদগণই সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। হ্যাঁ, কখনো ভুল হয়ে যেতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কতিপয় সাহাবীরও তো ভুল হয়েছে।

তাদের জাগতিক নীতিমালা অবলম্বন: যে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিংবা কোন দেশে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তি প্রদর্শন ও লড়াই-মোকাবেলার বিকল্প নেই। এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই যে শক্তি অর্জন ও প্রদর্শন, যুদ্ধ জিহাদ- রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই জগতের নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সশস্ত্র আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। অথচ হাত গুটিয়ে রাখা কতিপয় দল সশস্ত্র সহযোগী ও সদস্য সংগ্রহ করা থেকে দূরে থাকে। কারণ এর দ্বারা তাগুত গোষ্ঠী তাদের উপর চড়াও হবে, যার কারণে _তাদের ধারণামতে_ তাদের দাওয়াহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অন্য কোন দেশে বা নিরপদে জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায় এমন কোন পাহাড়ে

হিজরত করা থেকে দূরে থাকে, যাতে তারা এই অভিযোগে অভিযুক্ত না হয় যে, তারা তাগুতের রাষ্ট্র ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত! তাদের হিজরত পরিত্যাগের আরেক কারণ হল তারা দেশকে দায়ীমুক্ত রাখতে চায় না। অথচ তারা এর দ্বারা মক্কী জীবনের শরয়ী নীতির বিরোধিতা করেছে, একই সাথে জাগতিক নীতিরও বিরুদ্ধাচরণ করেছে। (বিস্তারিত, ইদারাতুত তাওয়াহুশ, পৃ. ৯৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু ইলম ও তাযকিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে অথচ বিজয় অর্জনের আশা করে, তার পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না। কারণ সে শরীয়ত ও জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে অর্থাৎ ই'দাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের নীতি বর্জন করেছে। এমনিভাবে যারা ভোটাভুটির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারাও এতে কিছুতেই সফল হতে পারবে না। বাস্তবতাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া এটা জগতের নীতিরও বিপরীত। তাহলে কেন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট নির্দেশনা তথা জিহাদ ছেড়ে দেব?! কেউ বলতে পারে, 'আমরা দুর্বল বিধায় জিহাদ ছেড়ে দিব।' আমরা বলব, দুর্বলতা কখনো নববী চিকিৎসা ছেড়ে দেয়াকে বৈধতা দিতে পারে না। বরং আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। জিহাদ ছাড়া আমরা শক্তিশালীও হতে পারব না, বিজয়ও অর্জন করতে পারব না। সুতরাং যে কোরআন-সুন্নাহ যথাযথ অনুসরণ করতে চায় তার জন্য এই দুটো বিষয় অপরিহার্য: দলিল-প্রমাণের জ্ঞান এবং তীর-তলোয়ার; পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারি। এরপর দায়িত্ব আল্লাহর-

وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

তোমার প্রতিপালক পথপ্রদর্শন ও সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। (ফুরকান, ৩১)

মোটকথা, শুধু ইলম ও তাযকিয়া নিয়ে বসে থেকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কারণ আপাতদৃষ্টে তা বাস্তবতা পরিপন্থী। আবার কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া জিহাদের পথে চলা যাবে না। কারণ তাতে বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ইলমও অর্জন করতে হবে, জিহাদও করতে হবে।

৮. কারণ ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে তারাই সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও ঘৃণার শিকার।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম : কোন দলটিকে ইহুদী-খ্রিস্টানরা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে?আমার মনে হল, ন্যায়সঙ্গত উত্তর এটাই যে, সেই দলটি হল আল কায়েদা। প্রত্যেক সঠিক বোধসম্পন্ন ইনসাফকরী ব্যক্তি এই উত্তরই দিবে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর নিজেকে আবার প্রশ্ন করলাম : কেন তারা ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে এতটা অপছন্দনীয়?আমার মন বললো, কারণ তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ তারা সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতার ক্ষেত্রে শরীয়তের আদেশ যথাযথ পালন করেছে। আল্লাহ কাফরেদের ব্যাপারে নবীকে আদেশ দিচ্ছেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

'হে নবী আপনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করুন।' (তাওবা, ৭৩)

সুতরাং যে এই বিধান পুরোপুরি পালন করবে, কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করবে না, কাফেরদের সাথে দরদাম করবেনা এবং কোন আকীদার ক্ষেত্রে নমনীয় হবে না, সে অবশ্যই তাগুতের গলার কাঁটায় পরিণত হবে এবং তারা তার প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণা পোষণ করবে। অপরদিকে যারা গণতন্ত্রের পথে চলবে এবং নিজ আকীদায় কিছুটা শিথিলতা করবে- যেমন কেউ আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর কতিপয় বিষয়ে শিথিলতার আশ্রয় নিল (যেমন কেউ প্রকাশ্য মুনাফিকের নিফাক জানা সত্ত্বেও তাকে নিজ ভাই ও বন্ধু বলে মেনে নিল কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য, শরীয়তের দলিল সমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না-) এভাবে যারা কাফেরদের সাথে নমনীয় ও কোমল আচরণ করবে কাফেররাও তাদের প্রতি নমনীয় হবে, কোমল আচরণ করবে- এটাই স্বাভাবিক।আল্লাহ বলেন,

وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

তারা কামনা করে যদি তোমরা নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে (সূরা আলকলম, আয়াত: ৯)

আর যারা স্পষ্টভাবে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'-এর ঘোষণা দিবে এবং কাফেরদের প্রতি নমনীয় হবে না তাদের প্রতি কাফেরদের বিদ্বেষ হবে চরম পর্যায়ের- এটাই জগতের রীতি ও নীতি। আল কায়েদার বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে

ইহুদী-নাসারাদের মিথ্যা প্রচারণার বিষয়টি সবারই জানা। এটা কিন্তু আল কায়েদার প্রতি তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, ইহুদীরা ফিলিস্তিনে আল কায়েদা ছাড়া অন্যান্য জিহাদী সংগঠনগুলোকে অতটা গুরুত্ব দেয় না। গাজায় আল কায়েদার উপস্থিতির পর থেকে তাদের ঘুম যেন হারাম হয়ে গেছে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি গাজায় হামাসের জিহাদকে খাটো করে দেখছি। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, শত্রুরা জিহাদী সংগঠনগুলোর মাঝে স্তর নির্ণয় করে থাকে এবং এভাবেই কোন দলের প্রতি তাদের আক্রোশ বেশি থাকে এবং কোনটার প্রতি কম।

ঈমানী দায়িত্ববোধে একটু চিন্তা করুন- আমি কথাগুলো বলব ঐ সকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে যারা ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আল কায়েদাকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। সাধারণ মুসলমান, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন এমন মুসলমান, তালিবে ইলম এবং যেসব আলেম আল কায়েদা সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পুষে রেখেছেন তাদের সকলকেই আমি কথাটা বলব। কথাটা হলো- আপনারা কিন্তু এক্ষেত্রে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের সঙ্গ দিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আমেরিকা যেমন অন্যান্য ইসলামী দলের তুলনায় আল কায়েদাকে বেশি অপছন্দ করে আপনারাও তেমন অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর তুলনায় আল কায়েদাকে বেশি অপছন্দ করেন। বিষয়টা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন?কখনো কি নিজেদের প্রশ্ন করেছেন, আমেরিকা আপনাদের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে কিভাবে তাদের সাথে একমত হয়ে গেলেন? কখনো কি ঠাণ্ডা মাথায় সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে চিন্তা করেছেন, আল কায়েদার কোন বিষয়টা আপনারা অপছন্দ করছেন? আল কায়েদা কি এমন কোন নীতির উপর চলছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আদর্শের বিপরীত? আল্লাহর অশেষ কৃপায় অবশ্যই আপনারা তা পাবেন না। তারা যাবতীয় মাসআলায় আহলে সুন্নাতের মানহাজেরই অনুসরণ করছে। রাষ্ট্রীয় আইনে যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসমতে তারা কাফের, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করে আহলে সুন্নাতের নিকট তারাও কাফের- এসব মাসআলায় আল কায়েদা সম্পূর্ণ আহলে সুন্নাতের মানহাজেরই অনুসরণ করেছে। আচ্ছা, আপনাদের কতিপয় কেন কাফেরদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতি আস্থা রাখে এবং মুজাহিদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতি আস্থা

রাখে না? কেন তারা মুজাহিদদের অডিও-ভিডিও ও তাদের খবরাখবর প্রচারের ঘোরবিরোধী? আচ্ছা, বলুন তো আমেরিকারা যদি জানতে পারে যে, আপনি মুজাহিদের খবরাখবর প্রচারে বাধা দিচ্ছেন তবে - নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন- এ কাজটি কি তাদের উৎফুল্ল করবে নাকি না? আপনি আরেকবার কল্পনা করুন সে সকল মুসলিমদেরকে যারা তাদের সন্তান, পিতামাতা ও স্ত্রীদের হারিয়েছে_যারা 'ওয়া-মু'তাসামাহ' বলে মুসলিমদের কাছে ফরিয়াদ করছিল_যখন তারা জানতে পারবে যে, আপনি মুজাহিদদের সংবাদ প্রচারে বাধা দিচ্ছেন তবে তারা কি এতে উৎফুল্ল হবে?? উত্তরটা সুবিচারকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাছেই আছে। কিন্তু সুবিচার কোথায়? সুবিচার পাওয়া তো বড় কঠিন। কবি বলেন- 'আমি আমার জাতিকে দেখেছি তারা একে অপরকে হত্যা করছে। কোন সালাহুদ্দিনের আহ্বান আর শোনা যায় না! তাই আমি কোন দিকে না তাকিয়ে এবং হতাশা প্রকাশ না করে আমার পথে চলেছি। আমার মন আমার বালিশ ও শয্যা ত্যাগ করেছে। আমার রূহ এসে গেছে আমার হাতের মুঠোয়। আমি আমার কামান বহন করে বেড়াই। যুদ্ধের সময় আমি আনন্দচিত্তে গেয়ে বেড়াই- আমি কখনো নম্র হবো না, ফাঁসি, হত্যা কিংবা দেশান্তর করে আমার দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।' বিচারের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহই জানেন। তখন তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

তখন তাদের এমন বিষয় প্রকাশ পেয়ে যাবে যা তারা কল্পনাও করত না। (সূরা যুমার, আয়াত : ৪৭)

৯. কারণ আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি তারা অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করে যে সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা হলো, সাহাবাগণ কেবল আল্লাহর জন্য পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পরই রাসুলুল্লাহকে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর তার প্রথমিক কাজগুলোর অন্যতম ছিল- মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করা। শায়খ মুবারকপুরী রহ. বলেন,

মদীনায় আগমনের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সমবেতস্থলরূপে মসজিদ নির্মাণ করেছেন তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার কাজ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে : তা ছিলো আনাস ইবনে মালিক রা. এর গৃহে মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা। তারা ছিলেন নব্বই জন; অর্ধেক মুহাজির ও অর্ধেক আনসার। পরস্পর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এমনকি বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও একজন আরেকজনের থেকে মীরাস পেত। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াত যখন নাযিল হল তখন ভ্রাতৃসূত্রে মীরাস লাভের বিষয়টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। আয়াত-

وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। –(সূরা আহযাব, আয়াত : ৫)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আমাদের এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে খেজুর বাগান ভাগ করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তখন তারা (মুহাজিরদেরকে) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন; আমরা আপনাদেরকে ফলে অংশীদার করবো। তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমি ইসলামী দলগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম তখন এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি দল পেলাম- তাবলীগ জামাত ও আল কায়েদা। যখন এই দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলাম তখন আল কায়েদাকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হল। কারণ তারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে আত্মোৎসর্গের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। অন্য ভাইয়ের জন্য নিজের জান কুরবান করে দেয় এবং নির্দ্বিধায় নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনো দেখা যায়, সেনাপতি তার সেনাদের লুকিয়ে যেতে আদেশ করেন এবং তিনি নিজে তাদের জন্য ঢাল হয়ে যান এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন; অবশেষে তিনি শহীদ হন আর তার সেনারা বেঁচে যায়। আবার কখনো কমান্ডার সেনাদের লুকিয়ে পড়তে আদেশ দিয়ে নিজেকে যখন মৃত্যুর মুখে

ঠেলে দিচ্ছেন, ঠিক তখনই কতিপয় সেনা তার আদেশ লঙ্ঘন করে তার পাশে এসে মৃত্যুর কাফেলায় অংশগ্রহণ করে। এটা তারা করে অবাধ্যতার কারণে নয় বরং আত্মোৎসর্গের চেতনায়। সুবহানাল্লাহ! এগুলো এমন ঘটনা যা উম্মাহর ইতিহাসে কেবল বিশেষ মুজাহিদ বান্দাদের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমি কতিপয় ইসলামী দলের সাথে ওঠাবসা করেছি। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ক্ষেত্রে আল কায়েদার মতো এতটা গুরুত্ব অন্য কোথাও পাইনি। আমি দীর্ঘদনি ইলমী মারকাযে থেকেছি। সেখানে কল্যাণ ও ইলমের বারিধারা থাকলেও সুবিচারকারী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে অনেক তালিবে ইলমের মাঝেই রয়েছে দুর্বলতা। যখন আমরা সীরাত পড়ি এবং অনেক তালিবুল ইলমের অবস্থা দেখি তখন সত্যিই আমাদের মাঝে সুদীর্ঘ ব্যবধান দেখতে পাই। আমি কয়েক বছর যাবৎ এ শূন্যতাটাই অনুভব করছিলাম। অতঃপর যখন আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করলাম তখন দেখতে পেলাম তারা অন্যদের থেকে অনেক ব্যতিক্রম। তারা একে অপরকে অনেক সম্মান ও মহব্বত করে। জিহাদের শিক্ষাকে যিন্দা করা ও জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখার শর্তে তারা অন্যদেরও ভালোবাসে। জেনে রেখ হে বিজয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, যে দল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না সে দল কোনদিনই বিজয় অর্জন করতে পারবে না। কারণ এটা মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণের আদর্শের বিপরীত। রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এটাই ছিলো তাদের আদর্শ। তাহলে এমন দল কীভবে বিজয়ের আশা করে যারা পরস্পরে কৃচ্ছতা করে, এক ভাই অপর ভাইকে প্রাধান্য দেয় না এবং তারা একে অপরের অনেক কাছে থাকা সত্ত্বেও মাসের পর মাস কেউ কারো সাথে দেখা করে না?

একটি ঘটনা : আমি একবার ইয়ামানের এক শায়খের নিকট ইলম অন্বেষণের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে আদনের কিছু ছাত্রের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তারাও শায়খের কাছে যাচ্ছিল। সেখানে যেই গাড়িটি ছাত্রদের আনা-নেওয়া করতো তার মালিক ছিলো ঐ শায়খের বড় ছাত্রদের একজন, এমনকি কখনো শায়খ না থাকলে সেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হত। আদন থেকে আসা ছাত্ররা তাদের বই ও আসবাবপত্র ঐ ছাত্রের গাড়িতে উঠাল। তারপর সে তাদের সাথে ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলল।

তাদের কাছে ভাড়া কিছুটা কম ছিল। তাই বড় ছাত্রটি তাদেরকে তার গাড়িতে উঠাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন তারা বাধ্য হয়ে তাদের কিতাবাদী ও আসবাবপত্র তার গাড়ি থেকে নামিয়ে অন্য গাড়ির খোঁজ করতে লাগল। পাঠক, আপনিই তার এই আচরণের প্রতি লক্ষ্য করুন! এটা যদি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যতিক্রম কোন ঘটনা হত তাহলে আমি তা উল্লেখ করতাম না। কিন্তু বাস্তবতা হল এমন ঘটনা অহরহর ঘটছে। কারণ ভ্রাতৃত্বটা তাদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয় এবং তাদের নিকট এর গুরুত্বও কম। আবার এর মানে এই নয় যে, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ মোটেই নেই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, একটি জিহাদী দল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দল থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। এর কারণ আল্লাহ তাদের এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। কারণ এ পথে সাধারণত সাহসীরাই বিচরণ করে। আর সাহসীরা মহৎ গুণের অধিকারী হয়। তাছাড়া মুজাহিদরা যখনই শত্রুদের থেকে শঙ্কিত হয় তখনই তাদের মাঝে মুহাব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, একে অন্যকে প্রধান্য দেয়ার আগ্রহ পয়দা হয়।

আশ্চর্য পরবির্তন : আমি এবং আরো কয়েকজন যুবক একটি দলের সাথে যুক্ত ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের মুজাহিদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করলেন। তখন আমাদের অবস্থা পুরো পরিবর্তন হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দুর্বল, পরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণটি আমাদের মাঝে ছিলই না, পরে আমরা অগ্রাধিকারে অভ্যস্ত হয়েছি। আমাদের মাঝে খুব কম যোগাযোগ হত, পরে তা নিয়মিত হতে লাগল। দেখুন, ব্যক্তি একই, কিন্তু কী পরিবর্তন! এসবই সম্ভব হয়েছে আল কায়েদায় যুক্ত হওয়ার কল্যাণে। আল কায়েদা এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই আমি আল কায়েদাকে সবচে' বেশি ভালোবেসেছি। তাদের মত মুহাব্বত কাউকেই করি নি। আর আমি এমন কোন মানুষ পাই নি যে আমাকে তাদের মতো ভালোবেসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কেউ তার ভাইকে ভালোবাসে তখন সে যেন তাকে তা জানিয়ে দেয়। আমি আমার ভাইদের ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিলাম। এখানে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই - বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে আল কায়েদার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকেই বোঝা যায় তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান এবং তারা তা কতটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... আপনার নেক দুআয় ভুলবেন না....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৫৪

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৬ষ্ঠ পর্ব, কারণ ১০ ও ১১)

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

১০. কারণ তারা সত্যিকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

এই শিরোনামের গুরুত্ব বোঝার জন্য এর শরয়ী বিধান জানা আবশ্যক। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অপরাগতার সময় শক্তি অর্জন করা এবং ঘোড়া (অস্ত্র) সংগ্রহের মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/২৫৯) শাইখুল ইসলাম রহ. তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ'য়ে "যা ব্যতীত কোন ওয়াজিব বাস্তবায়ন অসম্ভব তা অর্জন করাও ওয়াজিব" এই মূলনীতি প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত মূলনীতির একটি দৃষ্টান্ত হলো, জিহাদ ওয়াজিব। কিন্তু যখন জিহাদের সক্ষমতা না থাকবে তখন তার জন্য শক্তি অর্জন করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। কারণ জিহাদ একটি ফরজ আমল। আর যা ব্যাতীরেকে কোন ফরজ বাস্তবায়ন অসম্ভব হয় সেটা অর্জন করাও ফরজ হয়ে পড়ে। প্রিয় পাঠক, আমি আশা করি আপনি এই বিষয়টি ভালো করে উপলব্ধি করে নিবেন। সাথে সাথে ওয়াজিবের তাৎপর্য নিয়ে ভাববেন যে, আপনি তা বর্জনের দরুন গুনাহগার হচ্ছেন কি না! জিহাদের প্রস্তুতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে: ১. আকীদাগত প্রস্তুতি। ২. শারীরিক প্রস্তুতি। ৩. সামরিক প্রস্তুতি। ৪. অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি। অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী কোন জামাতের অধীনে সমবেত হওয়া জরুরী; যাতে আপনার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারটি সহজসাধ্য হয়। যে বিষয়টি আল কায়েদার প্রতি আমার মুগ্ধতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে তা হল-

আল কায়েদা শরয়ী বিবেচনার 'ই'দাদ'এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং সেটাকে কার্যত বাস্তবায়ন ও করেছে। সুতরাং ই'দাদ-এর ক্ষেত্রে আপনি অন্যান্য জামাত থেকে আল কায়েদাকেই উৎকৃষ্ট গণ্য করতে বাধ্য হবেন। বরং বাস্তবতা হলো কিছু দল প্রস্তুতিই নিচ্ছে না। আর কিছু দলের মাঝে ছড়িয়ে আছে ই'দাদ বিষয়ে চরম অবহেলা। যে সমস্ত দল ই'দাদ গ্রহণ করছে না বলে আমরা উল্লেখ করেছি তারা মূলত ই'দাদ-এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে। প্রথমতঃ তারা আকিদাগত প্রস্তুতির মাঝেই দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিচ্ছে। ফলে যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে আর তারা এটাকেই ই'দাদ ভাবছে। হাস্যকর বিষয় হলো তারা যেই প্রজন্মকে প্রস্তুত করছে তারা জিহাদের আকীদাই পোষণ করে না। বরং তাদের ধারণা হলো ভবিষ্যতে কেয়ামতের আগে এমন প্রজন্মের বা দলের আগমন ঘটবে যারা জিহাদ করবে। সুতরাং যখন গুরুদের মাঝেই ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে তখন শিষ্যদের অবস্থাই বা কেমন হবে?! তাই আমি বলি, এরা শরীয়তের দৃষ্টিতে ই'দাদ এর অর্থ বুঝতে পারেনি। যার দরুন আকীদাগত প্রস্তুতির মাঝেই এরা ক্ষান্ত আছে। আবার এই আকিদাগত প্রস্তুতির মাঝেও রয়েছে অনেক ত্রুটি। তাদের শিষ্যরা জানেও না যে, জিহাদ ফরজে আইন। আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর ক্ষেত্রেও তারা অবহেলা প্রদর্শন করে। এর প্রমাণ হলো, যদি ধরে নেয়া হয় এসব তাগুত কাফের শাসকবৃন্দ কাফের নয়, কিন্তু সর্বোচ্চ জালেম ও ফাসেক; তথাপি আপনি দেখতে পাবেন, তারা শাসক গোষ্ঠীর সাথে যথাযথ কঠোরতা অবলম্বন করে না, বরং কখনো কখনো তাদের প্রশংসা করে। জনসাধারণকে তাদের নির্বাচনের প্রতি আহ্বান করে। এরাই নাকি দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে। 'তাদের দোষত্রুটি গণব যায়; এর মানেই হল তারা মহান।' এ জাতীয় আরো অনেক সম্মানসূচক কথাবার্তা বলে শাসকদের সম্বন্ধে। আর এসব কর্মকাণ্ড তাদের থেকে প্রকাশ পাচ্ছে;['যাদের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখি এবং তারা দরবারী আলেমও নন। আকীদাগত প্রস্তুতির অবস্থা এমন হলে কখন উম্মাহর মাঝে এমন প্রজন্ম তৈরি হবে যারা লাঞ্ছনা কে ছুঁড়ে ফেলবে, আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করবে আর উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে? তারা এটাকেই প্রস্তুতি ভাবছে। অথচ তা তরুণদের মাঝে কেবল হতাশার বীজই বপন করছে। তাদের ধোঁকা দিচ্ছে যে, বর্তমান যুগে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তারা প্রকাশ্যেই নিজ মুখে এসব বলে বেড়ায়। যখনই জিহাদ এবং ই'দাদ প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখনই তারা বলে উঠে যে, এখন ঈমানী প্রস্তুতি নেয়া

জরুরী। যেন উলামা এবং তালিবুল ইলম ছাড়া আর কেউ জিহাদ করতে পারবে না। মূলত তারা নববী আদর্শকেই বুঝতে পারেনি। (সামনে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ) এই হল তাদের আকীদাগত প্রস্তুতির অবস্থা।

প্রস্তুতির অপর অংশ তথা সামরিক প্রস্তুতির অবস্থা হল, তারা এর জানাজা পড়ে দাফন সম্পন্ন করে রেখেছে। এখন মানুষের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সঠিক দল কখনো অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। বরং তারা হবে খুব নমনীয় ও নিরীহ। এসব ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর পিছনে অন্যতম কারণ হলো ই'দাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট শরয়ী নির্দেশনার বিরোধিতা, যা মুরজিয়াদের আদর্শ। ফলে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রেও তাদের এমন আদর্শের পরিবর্তন ঘটবে না। ৯/১১ এর পর মুজাহিদগণ ধার্মিক শ্রেণীর মাঝে এই ভ্রান্ত চেতনা দেখতে পেয়েছেন ই'দাদ একটি মহান ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা একটি তীরের কারণে তিন জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) তীর নির্মাতা যে পুণ্যের আশায় তা তৈরি করেছে (২) তীর নিক্ষেপকারী (৩) তা সংগ্রহকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজি এবং অশ্ব চালানো শিখো। তবে আমার কাছে অশ্ব চালানো থেকে তীরন্দাজি অধিক পছন্দের। আর যে তীরন্দাজি শিখে অনাগ্রহের কারণে তা ছেড়ে দিল সে যেন মহান আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামতকে অস্বীকার করল। (আবু দাউদ) ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শিখল অতঃপর অনাগ্রহের কারণে তা ভুলে গেল সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হল। হে প্রিয় ভাই, আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, কিছু দল শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট বিধানের ব্যাপারে চরম অবহেলা করছে। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, সেটা কী? সেটা হলো ই'দাদ, বিশেষতঃ সামরিক প্রস্তুতি। তারা কেন সামরিক প্রস্তুতিকে না বোঝার বাহানা করছে? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে ঘোষণা করেছেন, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রাখো, শক্তি হলো নিক্ষেপণ শক্তি! (মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি ১৫ বছর কিংবা তার চেয়ে কমবেশি সময় আকীদাগত প্রস্তুতিতে ব্যয় করেছে তার উদ্দেশ্যে আমি বলব, আপনার কি এখনো সামরিক প্রস্তুতি নেয়ার সময় হয়নি? নাকি আপনার মনে হয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা খুবই ভালো?! মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে? মানুষ কি তাদের অধিকারসমূহ গ্রহণ করতে পারছে? মুসলিমরা কি ইহুদি-খ্রিস্টান

এবং অন্যান্য শত্রুর কবল থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে? যদি এসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়েও থাকে তবুও ই'দাদের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে যতক্ষণ না কাফেরদের রাষ্ট্রগুলো বিজিত হয়। এটাই ইসলামের বিধান। আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ই'দাদের অর্থ বুঝেছে এবং যথাসাধ্য তা কার্যত বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে আল কায়েদা অন্য যে কোন দল থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এ বিষয়টি আমেরিকা এবং মুনাফিকদের মধ্যমপন্থী মতবাদের বিরোধী । (আল্লাহর কাছেই সমস্ত অভিযোগ। তাঁর উপরই ভরসা। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।)

১১. কারণ তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর হেকমত-মাসলাহাতকে প্রাধান্য দেয় না।

হেকমত মাসলাহাত একটি সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য কায়দা বা নীতি। কিন্তু এযুগে এটার অপব্যবহার বেড়ে গেছে। ভুল জায়গায় এর প্রয়োগের কারণে শরীয়তের অনেক আহকাম আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাই এই নীতিটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে এবং শরীয়তের দলীলের উপর একে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কোন মাসআলায় হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আলোচনার পূর্বে মূল মাসআলায় উভয় পক্ষের একমত হতে হবে। কেউ যদি এটা মানে যে, মানব রচিত সংবিধান কুফরী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা কুফরি, তাহলে মূল মাসআলায় সে আমাদের সাথে একমত। সুতরাং আমরা তার সাথে সমসাময়িক মাসআলায় হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আলোচনা করবো। আর যদি কেউ মানব রচিত সংবিধান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাকে কুফরি মনে না করে করে তবে তো মূল মাসালাতেই তার সাথে আমাদের মতবিরোধ। সুতরাং হেকমত মাসলাহাত নিয়ে আমরা তার সাথে কোন রকম তর্কে-বিতর্কে জড়াবো না। মৌলিক মাসআলায় যারা আমাদের সাথে একমত তাদের উদ্দেশ্যে বলব, 'মানবরচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনাকারী তাগুত শাসকদের নিরাপদ ও বিলাসী জীবন যাপন স্বয়ং একটি অশান্তি, অকল্যাণ। কারণ তারা কুফরের উপর জিহাদ বিহীন লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করছে। অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে মারমুখী যুদ্ধ কুফরের উপর শান্তিতে বসবাস করা থেকেও উত্তম। সুতরাং আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন!!!' আল কায়েদা মুরতাদ শাসকের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। কিন্তু অনেক ইসলামী দল তাদের মুরতাদ মনে করলেও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। কারণ তারা মনে করে, এটা দাওয়াতের হেকমত পরিপন্থী, অথচ এটা মিল্লাতে ইবরাহীম বা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্বে এ

বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা গিয়েছে। কতিপয় ক্ষুদ্র চিন্তাধারী রক্ত প্রবাহের কারণে মুজাহিদগণের কুৎসা রটনা করে। অথচ সে ভুলে যায় যে এখনো ভূপৃষ্ঠ থেকে শিরক বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যার কারণে পৃথিবীতে রক্ত ঝরছে। পৃথিবীর বুকে যতদিন শিরক থাকবে ততদিন রক্ত ঝরতে থাকবে এটা আল্লাহর আদেশ,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ

'তাদের সাথে লড়াই করে যাও যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়।'

সুতরাং বাস্তবতা হল এরা মূল সমস্যাটাই অনুধাবন করতে পারেনি। মূল সমস্যা হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া। শরীয়ত পতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই শত প্রাণ হরণ হচ্ছে এবং রক্তের সাগর প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং রক্ত ঝরার তুলনায় শরীয়ত প্রতিষ্টিত না হওয়াটাই আমাদের নিকট বড় বিষয় এবং এটা নিয়েই আমাদের উদ্বিগ্ন থাকা উচিত। সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. বলেন, শহরবাসী ও গ্রামবাসী পরস্পর লড়াই করে যদি নির্মূলও হয়ে যায় তবুও এটা তাদের জন্য একজন তাগুতকে শাসক বানানো অপেক্ষা ছোট পাপ। সাইয়েদ কুতুব রহ. বলেন, 'দাওয়াতের মাসলাহাত এমন একটি মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, দায়ীরা যার উপাসনায় ব্যস্ত থাকে এবং দাওয়াতের মূল পদ্ধতি ও পথ ভুলে যায়। দায়ীদের কর্তব্য, দাওয়াতের সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং সঠিক পথ অনুসন্ধান করে যথাযথ তার অনুসরণ করা। সঠিক পথ অনুসরণ করলে কী ফলাফল আসবে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করা বাঞ্ছনীয়। কারণ তা দাওয়াত ও দায়ীদের জন্য ঝুঁকি ও ভয়ের বিষয়। সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে -ফলাফলের দিকে তাকিয়ে কোন কারণে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। তাই দায়ীদের কাজ শুধু সঠিক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া, ফলাফল আল্লাহর হাতে। কল্যাণ কোথায় নিহিত আল্লাহ ভাল জানেন। তা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দায়ীদের নয়। তাদের দায়িত্ব শুধু দাওয়াতের পথে অবিচল থাকা এবং এ পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়া।'

বলছিলাম হেকমত-মাসলাহাতের কথা। হেকমত-মাসলাহাতের নামে এখন অনেক কিছু হচ্ছে : নির্দ্বিধায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যাচ্ছে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করছে এবং মুজাহিদদের নামে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। এই হেকমত-মাসলাহাতের কারণেই শরীয়তের দলিলসমূহ আপন মহত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছে, মানুষ যুক্তিকে শরীয়তের আহকামের

উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে, সমাজে অনেক বিদআত চালু হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; যার দরুন মুসলমানরা আজ সাহায্যবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। সুতরাং শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান। এই হেকমত-মাসলাহাতের নাম দিয়েই অনেক ইসলামী দল মার্কিন দূতাবাসে হামলার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে। এই হেকমত-মাসলাহাতের নাম দিয়েই আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর বিশুদ্ধ আক্বীদাকে মাটি চাপা দিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও রাফেজীদের সাথে পরামর্শ সভা সংঘটিত হয়েছে। গতকালও যারা রাফেজীদের কাফের বলতো তারাই আজ তাদেরকে ভাই ও বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আল কায়েদার অবস্থান একেবারে সুস্পষ্ট। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... আপনার নেক দুআয় ভুলবেন না....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৬২

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৭ম পর্ব, কারণ ১২)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৬-০৪-২০১৯

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

১২. কারণ তারা সরকারী আলেম নামক পরিভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

খাইরুল কুরুন থেকেই এই পরিভাষাটি হকপন্থী আলেমদের মুখে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের পূর্বসূরীগণ সরকারী আলেমদের থেকে সতর্ক থাকতেন এবং অন্যদের সতর্ক করতেন। কারণ তাদের রয়েছে অনিষ্টকর প্রভাব, তারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে দেয়। শাসকদের বক্রতাকে তারা শরীয়ত কর্তৃক বৈধতার প্রলেপ লাগিয়ে দেয় এবং সরকারের অপরাধ এমনকি তাদের কুফরীর ব্যাপারেও মৌনতা অবলম্বন করে। এইজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে শাসকদের দরবারে যাবে সে ফেতনায় পড়বে। (আবূ দাঊদ, আলবানী সহীহ বলেছেন।)

একটু চিন্তা করুন, পূর্ব যুগে তো এই পরিভাষা প্রচলিত ছিল এবং আলেমগণ সাধারণ মানুষকে তাদের থেকে সতর্ক করছেন। কিন্তু এখন যে ইসলামী দলগুলো আছে তাদের মুখ থেকে কেন আমরা এরূপ পরিভাষা শুনতে পাইনা? কেন তারা সরকারী আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক করেন না? আর যদি কেউ সতর্ক করেও

তাহলে অন্যরা তার সমালোচনা করতে থাকে। কারণ তা নাকি শাসকদের সাথে সালাফে ছালেহীনের মানহাজপরিপন্থী কাজ।

এর চেয়েও বেশি কষ্ট হয় এবং অন্তরে রক্তক্ষরণ হয় যখন তাদের কেউ কেউ- যারা অজ্ঞাতসারে মুরজিয়াদের আকীদার উপর রয়েছে- মানব রচিত সংবিধানের কুফরির কথা শুনে তখন তারা এটাকে অনৈক্যের কারণ মনে করে; যদিও তাদের একাংশ এটাকে কুফরি বলেই বিশ্বাস করে। আবার যখন কোন সরকারের বিরুদ্ধে আসল ফতোয়াটা প্রকাশ হতে দেখে তখন ক্রোধে ফেটে পড়ে। যেন এই ফতোয়ার কারণে ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলবো, সরকারের জন্য এত মায়া কেন আপনাদের? ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে তো এতটা ক্ষুব্ধ হন না??

প্রিয় পাঠকগণ, আপনাদের কি মনে হয় এই জামানায় সরকারী আলেম নেই? সরকারী আলেমদের ব্যাপারে চুপ থাকা এবং সতর্ক না করা কি সালাফে ছালেহীনের মানহাজ?

উত্তর প্রত্যেক ন্যায়বিচারকেরই জানা আছে। তা হচ্ছে, এ জামানায় সরকারী আলেম আছে এবং তাদের থেকে সতর্ক করা সালাফে সালেহীনের মানহাজ ছিল। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ তাবেঈ সুফিয়ান আস সাওরি রহ. এর কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ইমাম যাহাবী বলেন, সুফিয়ান বলেন, তুমি যদি দেখ যে, কারী (আলেম) সরকারের কাছাকাছি থাকে তাহলে তুমি ধরে নেবে সে চোর। আর যদি দেখ, সে কোন ধনী ব্যক্তির কাছাকাছি থাকে তাহলে ধরে নেবে সে ধোঁকাবাজ। সুতরাং শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান। শয়তান তোমাকে বিভিন্ন সূরতে ধোঁকা দিতে পারে। শয়তান তোমাকে বলবে, সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুমি জুলুম দূর করবে এবং মাজলুমের প্রতিরক্ষা করবে। এটা ইবলিসের ধোঁকা মাত্র, কারীরা (আলেমরা) এটাকেই ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। (দেখুন, আল কাওলুন নাফীস ফিত তাহযীরি আন খাদীআতি ইবলীস "মাসলাহাতুদ-দাওয়াহ", পৃষ্ঠা : ৩০)

সুফিয়ান ইবনে আব্বাদ এক পত্রে নিজ শিষ্যের উদ্দেশ্যে লেখেন, আমিরদের থেকে দূরে থাকবে। তাদের কাছেও যাবে না। কোন কারণেই তাদের সাথে মিশবে না। তুমি যেন ধোঁকাগ্রস্ত না হও। শয়তান তোমাকে বলতে পারে, তুমি আমিরের কাছে মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, মাজলুমের প্রতিরক্ষা করবে এবং আমিরের

জুলুম বিদূরিত করবে। এটা শুধু ইবলিশের ধোঁকা; ফাসিক কারীরা (আলেমরা) এটাকে ঢাল বানিয়ে আমিরদের দরবারে আসা যাওয়া করে। (দেখুন, প্রাগুক্ত)

প্রিয় পাঠক, আজ যদি সুফিয়ান সাওরী জীবিত থাকতেন তাহলে সেই সব আলেমদের ব্যাপারে কী বলতেন, যারা আমেরিকান মুসলিমদের জন্য আফগানিস্তানের অনুপ্রবেশকারী মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগদান বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছে? যে সকল আলেমরা ৯/১১ এ নিহত হওয়া লোকদের নির্দোষ দাবি করেছে এবং কেউ কেউ তাদের জন্য দান করার আহ্বান জানিয়েছে তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন? এমন আলেমদের ব্যাপারে সুফিয়ান সাওরী ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামগণ কী বলতেন যারা মৌনতা অবলম্বন করেছে এবং বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন বলে ফতোয়া দেয়নি তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন, মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো উড়ে উড়ে মুসলিমদের হত্যা করছে, অতঃপর মুসলিমদের প্রহরায়ই আপন ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো নির্বিঘ্নে আরবসাগর পারি দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করার জন্য যাচ্ছে? তিনি কী বলতেন যদি দেখতেন মার্কিন সেনাবাহিনী লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা করছে আর আরবের শাসক ও মুসলমানরা তেল, খাদ্যসম্ভার ও মিডিয়া দিয়ে তাদের সাহায্য করছে এবং মুজাহিদদের বাধা প্রদান করছে? তিনি কি তাদের কাফের ফতোয়া দিতেন না? সুফিয়ান সাওরী রহ. আমীরদের অপছন্দ করতেন, যদিও তারা শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করত এবং কুফরী রাষ্ট্রগুলো বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনীও প্রেরণ করত। কেবল কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ করতো। এ কারণে আবু সুফিয়ান তাদের থেকে দূরে থাকতেন। এমনকি তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। কিছুদিন ইয়ামান বা মক্কা শরীফে, পরে বসরা নগরীতে আত্মগোপন করে থাকেন। গোপনে তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আত্মগোপন করা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হঠাৎ তাঁর মরদেহ মানুষের সামনে বের করে আনা হয় এবং জানাযা পড়া হয়। সুফিয়ান সাওরী রহ. সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন, তুমি কি জানো, ইমাম কে? ইমাম হলেন সুফিয়ান সাওরী, আমার হৃদয়ে তার চেয়ে অগ্রগামী কেউ হতে পারবেনা। সুফিয়ান সাওরী বলেন, যখন দেখি কোন বিষয়ে কথা বলা আমার কর্তব্য অথচ সে বিষয়ে কথা বলতে পরি না। তখন আমার পেশাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত নির্গত হয়।'

আজ যদি সুফিয়ান সাওরী ও তাঁর যুগের ইমামগণ জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা আরবের তাগুত শাসকদের ব্যাপারে কী বলতেন যাদের সহযোগিতায় ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলিম দেশগুলো দখল করছে?

প্রিয় ভাই, কতিপয় আলেম লাঞ্ছনাকর ফতোয়া প্রদান করেছে। কিন্তু তারাই আজ সম্মানের পাত্র। এরা যদি সুফিয়ান সাওরীর যুগে থাকত তাহলে মুসলমানগণ তাদেরকে 'দরবারী আলেম' বলতে দ্বিধাবোধ করত না।

বর্তমানে আল কায়েদা এ পরিভাষাটিকে পুনরুজ্জীবিত করছে এবং এক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী। বিরোধীরা কখনো আপত্তি করে যে, আল কায়েদা আলেমদের নিন্দা করে। তাদের জবাবে আমরা বলবো, উলামায়ে রব্বানী বা হক্কপন্থী আলেমগণ আল কায়েদার কাছে সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাদের কাছে দরবারী আলেমদের কোনই সম্মান নেই। সুতরাং যারা আমেরিকার স্বার্থে কথা বলে, মুজাহিদদের আকীদায় আঘাত করে এবং তাদেরকে খাওয়ারিজ ও ভ্রান্ত দল বলে অভিহিত করে তাদের সম্মান করতে আমরা বাধ্যও নই, আদিষ্টও নই এবং একারণে আমরা নিন্দিত হবো না। তবে কখনো কখনো হকপন্থী আলেমদের মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের হয় যা মুজাহিদদের আঘাত করে এবং যাতে শত্রুদের স্বার্থ হাসিল হয়। কিন্তু একারণে আমরা তাদের দরবারী আলেম বলবো না। এ যুগে যারা জিহাদের পথে চলছে তাদের মধ্যে এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে আল কায়েদাই বেশি অগ্রগামী। এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ এ পরিভাষাটির বিলুপ্তি সালাফে সালেহীনের মানহাজপরিপন্থী এবং এতে উম্মাহ ধোঁকাগ্রস্ত হবে। তাছাড়া উম্মাহর শত্রুরাও এ থেকে উপকৃত হবে। তাই এ পরিভাষাটির পুনরুজ্জীবন উম্মাহর জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ পরিভাষাটি পুনরুজ্জীবিত করা উম্মাহ জন্য কল্যাণকামিতার নামও বটে। কারণ এটা দ্বীনের বিষয়। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কার থেকে দ্বীন নিচ্ছি!

দরবারী আলেমদের কারণে অনেক কল্যাণের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সবচে' উত্তম কল্যাণের দ্বার জিহাদও তাদের কারণেই বন্ধ হয়েছে। অথচ জিহাদ অনেক ক্ষেত্র যথেষ্ট ফলপ্রসূ ইবাদত। শায়খুল ইসলাম বলেন,

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد في سبيل الله.

কেউ অনেক বেশি গুনাহ করে ফেললে তার সর্বোত্তম প্রতিষেধক ও কাফফরা হল জিহাদ করা। (আল ফাতাওয়া, ২৮/৪২১)

দরবারী আলেমরা অনেক সময় এমন বিষয়ের বৈধতার ফতোয়া দেয় যা বাস্তবে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে না। যে আলেম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করে না আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তার জন্য সবচে' নিকৃষ্ট উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি (অর্থাৎ তার অনুসরণ করে নি) তাদের দৃষ্টান্ত হল পুস্তক বহনকারী গাধা! যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না মন্দ! আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা জুমআ', আয়াত : ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ،وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম। অতঃপর সে তা বর্জন করে, পরে শয়তান তার পেছনে লাগে আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে, বোঝা না চাপালেও সে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ। তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৫ও ১৭৬)

কেউ ইলম গোপন করলে সে ব্যাপারে রয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারি। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য। কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে আল্লাহ তাদের লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিসম্পাত করে। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তওবা আমি কবূল করি। আমি অতিশয় তওবাগ্রহণকারী, দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৯-১৬০)

সুতরাং আপনার কি মনে হয়, আমাদের পূর্বসূরীগণ এমন কিছু মানুষ থেকে সতর্ক থেকেছেন যাদের অস্তিত্ব ছিলো না বলে ধারণা করা হয়? আপরার কি মনে হয় আল্লাহ এমন কিছু মানুষকে লা'নত করেছেন যাদের অস্তিত্বকেই আজ অস্বীকার করা হচ্ছে? বস্তুত অবশ্যই তাদের অস্তিত্ব আছে। কারো যদি মনে হয় যে, বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব নেই, তবে সে যেন নিজের আকল ও বুদ্ধিকেই এজন্য ত্রুটিযুক্ত মনে করে এবং মুজাহিদদের এই বলে অপবাদ না দেয় যে, তারা আলেমদের নিন্দা করে। হ্যাঁ, জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় লোক কখনো আলেমদের সাথে মন্দ আচরণ করে। কিন্তু এ কারণে সকল মুজাহিদের উপর দায় চাপানো ও অপবাদ দেয়া যাবে না। কারণ প্রত্যেক দলেই কিছু উচ্ছৃঙ্খল মানুষ থাকে।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... আপনার নেক দুআয় ভুলবেন না...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৬৯

কেন আমি আল কায়েদায় অংশগ্রহণ করলাম

(৮ম পর্ব, কারণ ১৩-১৫)

নীরব পথচারী

Junior Member

০৮-০২-২০১৯

মূল

শায়খ আবু মুসআব মুহাম্মদ উমায়ের আল কালাবী আল আওলাকী রহ.

ভাষান্তর

আবু হামযা আল হিন্দী

১৩. কারণ তারা আলেমদের যথাযোগ্য সম্মান করে, তবে তাদেরকে একেবারে নিষ্পাপ মনে করে না।

কেউ বলতে পারে, আপনি আল কায়েদার অতিরিক্ত প্রশংসা করছেন! আমি বলব, আমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই লিখি। বাস্তবতা এটাই যে, আমি দেখেছি তারা আলেমদের ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে না ভেবে যথাযোগ্য সম্মান করে অর্থাৎ আলেমদের সম্মান করতে গিয়ে তাদের ভুলের ঊর্ধ্বে ভাবে না এবং নিষ্পাপ মনে করে না, বরং এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করে।

এখানে আরেকটি কথা বলা সঙ্গত মনে করছি। বাস্তবতা ও তাত্ত্বিকতার মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অনেক ছাত্রই একটা মূলনীতি নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা খুব করে, কিন্তু বাস্তবে তার পুরো বিপরীত কাজ করে। যেমন একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল,

الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله.

‘ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চেনা যায় না, সত্যের মাধ্যমেই ব্যক্তির অবস্থান নির্ণীত হয়। সুতরাং তুমি সত্যকে চেনো তাহলেই সত্যপন্থীকে চিনতে পারবে।’ এটি ছাত্রদের মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি। কিন্তু বাস্তবে কত ছাত্র যে এর বিপরীত কাজ করে তার ইয়ত্তা নেই! যার ফলে দেখা যায় অনেক ছাত্র জিহাদ ও আকীদা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে কথা বলে আর সে মনে করে, এটা সে দলীলের আলোকে জেনেছে। অথচ বাস্তবে সেটা অন্যের মুখ থেকে জানতে পেরেছে। অনেক সময় সে মুজাহিদদের ব্যাপারে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলে। অথচ সে ভালোভাবে না বুঝেই এসব বিষয়ে কথা বলছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, জিহাদবিরোধী চিন্তাধারী এক ছাত্রের সাথে ইলমী তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। সে জিহাদী মানহাজের ব্যাপারে কুৎসা রটাচ্ছিলো এবং খুব নিন্দা করছিল। সে যুবকদের সতর্ক করছিল এবং সর্বশক্তি ব্যয় করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলো। সে দুঃসাহসিকতার সাথে এসব বলে যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে কাফেরদের সাহায্য করার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলাম। সে উত্তর দিলো, সাহায্যকারী কখনও বাধ্য হয়ে কিংবা তাবিল বা ব্যাখ্যা করে সাহায্য করে থাকে। তখন আমি তার কথা মেনে নিয়ে বললাম যদি সে বাধ্য কিংবা তাবিলকারী না হয়? তখন সে কোনো জবাব দিতে পারল না! আমি বললাম, তুমি এই মাসআলাটাই জানো না! তাহলে কেন মুজাহিদদের নামে কুৎসা রটাচ্ছো? মুজাহিদগণ যেসব মূলনীতি অনুসরণ করে থাকে তুমি তো তা বোঝো না! তখন সে বলল, তাদের বিরুদ্ধে কি হুজ্জত কায়েম হয়েছে? আমি বললাম, হুজ্জত কায়েম হওয়ার মানে কী? সে বলল, কোন গ্রহণযোগ্য আলেম এ ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া ও এজাতীয় আরো কিছু কথা বলল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তো দেখি হুজ্জত কায়েম হওয়ার মানেই বোঝ না! অতঃপর আমি তাকে এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যটি শোনালাম এবং হুজ্জত কায়েম হওয়া ও হুজ্জত অনুধাবনের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করলাম। অতঃপর বললাম, মুজাহিদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার পূর্বে এই মাসআলাগুলো দেখে নিবে। কিন্তু সে কোন ভ্রুক্ষেপ করলো না, সে কোন ভিত্তি ছাড়াই কতিপয় আলেমের তাকলিদ করে নিজের গোঁড়ামির উপর অটল থাকলো। তো কোন আলেমের অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার উপর এমন অটল থাকা বা এই জাতীয় আচরণক করাকেই বলে আলেমদের ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ভাবা এবং তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা।

অনেকে আল কায়েদার ব্যাপারে আপত্তি করে বলে যে, আল কায়েদা নাকি আলেমদের ভুল ধরে, নিন্দা করে। অথচ বাস্তবতা হলো আমরা (আল কায়েদা) আলেমদের সম্মান করতে ও তাদের পদস্খলন ও অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করতে আদিষ্ট।

হ্যাঁ, আমরা শুধু ঐ সকল আলেমদেরই সম্মান করতে আদিষ্ট যারা হলেন রাব্বানী বা হকপন্থী, যারা দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করে। আর যারা ইহুদী-খ্রিস্টান ও তাগুতদের পক্ষে ফতোয়া দেয়, মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের রক্ত প্রবাহিত করাকে বৈধ মনে করে- এমন আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলতে মুজাহিদদের কোন সমস্যা নেই।

সর্বোপরি, আমাদের মুজাহিদ ভাইদের উচিত আলেমদের সাথে মধ্যপন্থার আচরণ করা, তাদের বক্তব্যকে আমরা কোরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্যও দিব না, আবার তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও অসমীচীন আচরণও করব না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ বলেন, কিছু লোকের বোধশক্তি এতোটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে, তারা আলেমদের কথা মোটেই গ্রহণ করে না এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। অন্য একদল লোক এক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলেছে। ফলে আলেমরা যা হালাল করেছে তাই হালার মনে করেছে, যা হারাম করেছে তাই হারাম মনে করেছে আর তাদের বক্তব্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট ও সহীহ সনদে সাব্যস্ত সুন্নতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। (ইগাছাতুল লাহফান, ১/১১৭)

সুতরাং আপনি সতর্ক থাকুন। অনেক সময় হয়তো আপনি ভাববেন, আপনি আলেমদের সম্মান করছেন। অথচ বাস্তবে আপনি তাদের ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ভাবছেন। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য ফতোয়া প্রদানকারীর প্রতি না তাকিয়ে কতিপয় ফতোয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং ফতোয়াগুলো আপনার সুস্থ বিবেকের সামনে উপস্থাপন করে সেক্ষেত্রে আপনার অবস্থান নির্ণয় করুন। ফতোয়াগুলো শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরি রহ. এর গ্রন্থ 'ক্রুসেড যুদ্ধের স্বরূপ' থেকে নেয়া :

১. জামে আজহারের শায়খ সাইয়েদ তানতাভীর ফতোয়া : তাকে যখন ৯/১১ এর হামলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন মাজলুমের সাহায্যে আল আজহারের ভূমিকা বা অবস্থান কী জানতে চাওয়া হল। তিনি উত্তর দিলেন, 'নিরাপদ ব্যক্তিদের উপর হামলা করা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল। যেমন নিউইয়র্কের বিশ্ব

বাণিজ্য কেন্দ্রের হামলাটি।' তারপর যখন আফগানিস্তানের উপর সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হল তখন তিনি ফতোয়া দিলেন, 'প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ করা। ইসলামের অবস্থান সর্বদা মাজলুমের সাথে এবং জুলুম, সন্ত্রাসবাদ ও সীমালঙ্ঘনের বিপরীতে। সুতরাং যেকোনো রাষ্ট্রের উপর জুলুম ও সীমালংঘন করা হলে আমরা মুসলিমরা তাদের পক্ষে থাকবো যাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছে, চাই তা আমেরিকা হোক বা অন্য কোনো রাষ্ট্র।' তিনি এ বিষয়েও খুব গুরুত্বারোপ করেন যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা হত্যাকাণ্ডে জড়িত কোন ব্যক্তি কে বিচারের কাঠগড়ায় তখনই দাঁড় করানো উচিত যখন তার অপরাধ অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে।

২. সৌদী বিচার বিভাগের প্রধান শায়খ সালিহ আল লুহাইদানের ১/৭/১৪২২হি. তারিখের ফতোয়া:

'ভিন্নধর্মীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মাজলুম ও নিপীড়িতদের সাহায্য করা ও কঠোর হাতে জালেমকে প্রতিহত করা জুলুম দমনের অন্যতম মাধ্যম।' তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঐ সকল হামলায় আক্রান্তদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারের নামান্তর। তাছাড়া এটা আল্লাহর পথে দাওয়াতের একটি মাধ্যম এবং ইসলামের উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রমাণবাহক।'

নিউইয়র্ক ও অন্যান্য স্থানের হামলায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় রক্ত ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার বৈধতা সম্পর্কে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি একটি হাদীস বললেন,

في كل كبد رطبة أجر

প্রত্যেক তরতাজা প্রাণেই রয়েছে প্রতিদান।

এবং একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত এতিম ও বন্দীদের আহার দান করে। (দাহর, আয়াত : ৮) (উল্লেখ্য, আয়াতে উল্লিখিত বন্দীটি কাফের ছিল।)

এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফেরের প্রয়োজন পূরণে তাকে সাহায্য করা হলো মানব সম্প্রদায়ের প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করা এবং তা আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাধ্যম ও ইসলামের উচ্চ শিক্ষা এবং আল্লাহর জন্য সত্য দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা মুসলিমের উত্তম চরিত্রের প্রমাণ বাহক। মাজলুম যদিও কাফের হয় তাকে সাহায্য করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কোন গুনাহ হবে না।

৩. শায়খ করযাভী আমেরিকার বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনাকে শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আমরা সকল মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করছি যেন তারা আমেরিকার দুর্ঘটনা কবলিত নির্দোষ মানুষদের স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।'

৪. রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর ফতোয়া : ডক্টর আব্দুল মুহসিন তুর্কী ২৯/৬/১৪২২ হিজরীতে একটি ফতোয়া প্রকাশ করেন। তাতে তিনি আমেরিকায় সংঘটিত হামলাগুলোর কঠোর নিন্দা করেন এবং সেই হামলা ও হামলাকারীদের থেকে ইসলামের দায়মুক্তির ঘোষণা দেন। তিনি দীর্ঘ চাটুকারিতার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, 'মুসলিম জনগণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। কারণ ইসলাম মুসলিমকে হত্যাকারী, হত্যা কাজের মাধ্যম কিংবা মানুষকে সন্ত্রস্ত করে বা কষ্ট দেয় এমন কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করে। কারণ এসব জুলুম ও অন্যায়।' তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অতি দ্রুত বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধের রাষ্ট্রীয় আইন কানুন কার্যকর করা উচিত।'

৫. অবশেষে সৌদির প্রসিদ্ধ মুফতি শায়খ আবদুল আজিজ আলে শায়খের ফতোয়া উল্লেখ করছি-

যুক্তরাষ্ট্রে যে বিস্ফোরণগুলো ঘটেছে, বিমান ছিনতাই, নিরাপদ জনগণের মনে ত্রাস সৃষ্টি ও অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা ও এই জাতীয় যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো অন্যায়, জুলুম ও বিদ্রোহের নামান্তর। এগুলো হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তিনি এটাও খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের যেসকল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে শত শত মানুষের প্রাণহানি হয়েছে সেগুলো এমন কাজ ইসলামী শরীয়ত যার অনুমোদন দেয় না এবং তা কোন দ্বীনি কাজ নয় ও ইসলামী শরীয়তের মূল নীতির সাথে তা মিলে না।

(আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন: **حقيقة الحروب الصليبية**)

১৪. কারণ তারা মুহাক্কিক আলেমদের পথে চলে।

আকিদার কিতাব সমূহে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মানহাজ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে আল কায়েদা আহলে সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেমদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। আহলে সুন্নাহর আকিদা হল-

এক. আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী আইন রচনা করা বিনা বাক্যে কুফর। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নাকি তাদের রয়েছে এমন শরীক যারা দ্বীনের এমন সব বিধান রচনা করে আল্লাহ তায়ালা যার অনুমতি দেননি? যদি পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকতো তবে নিশ্চিত তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া হতো। আর নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সুরা শূরা, আয়াত: ২১)

তিনি আরো বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

জেনে রাখো, সৃষ্টি ও বিধান দানের ক্ষমতা কেবল তাঁরই। (আ'রাফ, আয়াত:৫৪)

আল্লামা শানকীতী রহ. বলেন, বিধান রচনায় আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা ইবাদতে শরীক করার মতোই আল্লাহ তাআলা তার বিধান দানের ক্ষমতার ব্যাপারে বলেন,

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

আর তারা যেন তার হুকুমের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ, আয়াত:২৬)

সাত কিরাতের মধ্য থেকে ইবনে আমেরের কিরাতে নাহি তথা নিষেধ বাচক শব্দ যোগে এসেছে: "আর তুমি বিধান রচনায় তার সাথে কাউকে শরীক করো না।"

মহান আল্লাহ তাআলা ইবাদতের শিরকের ব্যাপারে বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতের মাঝে কাউকে শরীক না করে। (কাহাফ, আয়াত: ১১০)

সুতরাং এ উভয় প্রকার শিরকের ক্ষেত্রে সমান। (আদওআউল বায়ান ৭/৪৮) তিনি আরো বলেন, উল্লিখিত নসসমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যারা শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মাধ্যমে রচিত আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী বিধানের অনুসরণ করে তাদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে কেবল ওই ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে যাকে আল্লাহ তাআলা অন্ধ বানিয়েছেন এবং ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন। (আদওআউল বায়ান, ৩/২৫৯) আর আল কায়েদাও একই মত পোষণ করে।

দুই. আহলে সুন্নাহের নিকট আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সালা করা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: সামগ্রিকভাবে বিচারকার্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো বিধানাবলী দ্বারা পরিচালনা করা। এটা কুফরে আকবার তথা বড় কুফর।

দ্বিতীয় প্রকার: নির্দিষ্ট কোন মুকাদ্দমায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা করা। এটা কুফরে আসগর তথা ছোট কুফর। আর আল কায়েদাও এ কথারই প্রবক্তা।

তিন. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য করা: আহলে সুন্নাহর আকিদা মতে আল কায়েদা বিশ্বাস করে যে, এ কাজ কুফর। যেমনটি শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব রাহি. ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ এর অধীনে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, (ঈমান ভঙ্গের) অষ্টম কারণ: মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা করা। এর দলিল হল নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (মাজমুউত তাওহীদ, ২৪)

চার. হুজ্জত কায়েম হওয়া :- এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল হুজ্জত কায়েম হওয়া এবং তা বোঝার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া হুজ্জত কায়েম হওয়া কেবল অস্পষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে শর্ত। সুস্পষ্ট এবং অকাট্য বিষয়ে নয়। সাথে সাথে অন্যান্য শর্ত পূরণ হওয়া এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়াও বিবেচ্য বিষয়। আল কায়েদা উল্লিখিত নীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি কেউ ইনসাফের দাবি করে সে যেন উক্ত মাসাআলায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য পড়ে নেয়। অতঃপর তাদের এবং আল কায়েদার মূলনীতির মাঝে সামাঞ্জস্যতা অনুধাবন করে: কারা বিচক্ষণ ও বিদগ্ধ ইমামদের মানহাজের অনুসরণে ধন্য হয়েছে? আল কায়েদা নাকি তারা, যারা বিধান রচনাকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ভাবে এবং মনে করে, সামগ্রিকভাবে ও নির্দিষ্ট মুকাদ্দমায় আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচারকার্য পরিচালনা করা একই রকম আর এ ক্ষেত্রে ইসতিহলাল (বৈধ ভাবা) ছাড়া কুফরও হবে না? আবার এই বৈধ ভাবাও কতকের নিকট সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছাড়া জানা সম্ভব নয়!! কারা বিচক্ষণ ইমামদের মানহাজের অনুসারী; আল কায়েদা নাকি তারা, যারা বলে শাসকরা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞতার ওজরের কারণে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না। কেননা তাদের কাছে হুজ্জত পৌঁছেনি? মূলত তারা জানেই না, প্রকাশ্য বিষয়ে হুজ্জত কায়েম হওয়া শর্ত নয়। এটা কেবল অস্পষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেই ধর্তব্য। পূর্বে এ বিষয়ে আমরা কতিপয় আলেমের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তারা এটাও জানে না, হুজ্জত কায়েমের অর্থ হচ্ছে হুজ্জত পৌঁছা কিংবা তা পৌঁছার ব্যবস্থা থাকা। যার কাছে পৌঁছাবে অথবা পৌঁছার সুযোগ থাকবে তার ওপরই হুজ্জত কায়েম হয়ে যাবে। তর্ক শাস্ত্রবিদদের প্রতিউত্তরে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রাসুলদের ব্যাপারে আল্লাহর হুজ্জত মূলত তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকার দ্বারাই কায়েম হয়ে গেছে। এজন্যই মাদঊদের ইলম শর্ত নয়। ফলে কুরআন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও অনুধাবন থেকে কাফেরদের উপেক্ষা হুজ্জত কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় নি। এমনিভাবে নবীদের থেকে বর্ণিত নির্দেশনাবলী থেকে তাদের অনাগ্রহ হুজ্জত কায়েমের ক্ষেত্রে বাধা হয়নি। কেননা জ্ঞান লাভের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। (অররদ্দু আলাল মানতিকীয়ীন, ৯৯)

তিনি আরো বলেন, যদি কেউ তার বার্তায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সংগঠিত হওয়ার সংবাদ দেয় তখন সেই আদেশ ও নিষেধ পৃথিবীর সকল

ব্যক্তির নিকট পৌঁছা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সংঘটিত হওয়ার শর্ত বলে গণ্য হয় না। স্বয়ং রিসালাতে নববীর ক্ষেত্রে যখন এটা শর্ত নয় তখন কিভাবে সেটা তার আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে শর্ত হবে। বরং তার নিকট পৌঁছা সম্ভব থাকাই শর্ত। এরপর যদি তারা অবহেলা করে এবং সেই বার্তা তাদের নিকট পৌঁছার চেষ্টা না করে তাহলে এর দায়ভার মুকাল্লাফদের উপর বর্তাবে; দায়ীর উপর নয়। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড: ২৮, পৃ. ১২৫-১২৬)

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, শাইখুল ইসলামের যে বক্তব্য তোমরা উল্লেখ করেছ 'যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে এবং তার উপর হুজ্জত কায়েম হবে' এবং এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমরা বর্তমান তাগুত ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে সন্দিহান যে, তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়েছে কিনা- এটা আশ্চর্যের বিষয়! তোমরা কিভাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ করো অথচ আমি বারবার তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। শোন, নতুন ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা সদূর মরুতে বসবাসকারী হলে অথবা আলোচ্য বিষয়টি অস্পষ্ট হলে তবেই হুজ্জত কায়েমের প্রশ্ন আসবে। সে অস্পষ্ট মাসালা না জানা পর্যন্ত তাকে তাকফির করা হবে না। কিন্তু দ্বীনের যে সব মৌলিক বিষয় মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র কিতাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সে সব বিষয়ে কোরআনই হুজ্জত। সুতরাং যার কাছে কোরআন পৌঁছেছে তার কাছে হুজ্জত ও পৌঁছে গেছে। আসল কথা হচ্ছে তোমরা হুজ্জত কায়েম হওয়া আর তা বোঝার মাঝে পার্থক্য করতে পার না। দেখ, অধিকাংশ কাফের এবং মুনাফিক আল্লাহর হুজ্জত বোঝেনা। কিন্তু তাদের উপর সেই হুজ্জত ঠিকই কায়েম হয়ে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

আপনি কি মনে করেন তাদের অধিকাংশই শুনে অতঃপর বুঝে? তারা তো চতুষ্পদ প্রাণীর মত। বরং তারা আরো পথভ্রষ্ট।

হুজ্জত কায়েম হওয়া এবং পৌঁছা ভিন্ন বিষয় যা এদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হয়েছে আর হুজ্জত বোঝা ভিন্ন বিষয়। (মুআল্লাফাতুশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, পৃ. ২৪৪)

সুতরাং বর্তমান শাসক শ্রেণীর কাছে কি হুজ্জত পৌঁছেনি? তারা কি হুজ্জত জানতে সক্ষম নয়? হুজ্জত কি শরীয়ত পরিবর্তন ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাহায্য করার মতো অকাট্য বিষয়গুলোতেও শর্ত, নাকি এটা বোঝা শর্ত যে, আল কায়েদা হকের উপর আছে? আল কায়েদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি তাদের বুঝে আসা শর্ত নয়। যে এমন শর্ত করল সে যেন হুজ্জত 'বোঝা'কে শর্ত করল। দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে।

হে মুমিন ভাই, উক্ত মাসআলায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামদের বক্তব্য সামনে রাখুন। অতঃপুর মিলিয়ে দেখুন যে, আল কায়েদা কি তাদের মূলনীতি বিরোধী নাকি না!

তাছাড়া শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগও রয়েছে।

এখন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই,

(১) আল কায়েদার কারো শাখাগত বিষয়ের ভুলকে আপনি কি মৌলিক বিষয়ে ভুলের মতো ভাববেন?

(২) বলা হয়, যেহেতু তোমরা শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগ আছে বলে মনে কর তাহলে কেন সেসব আলেমদের ঘৃণা কর যারা শাসকদের তাকফীর করে না?

আমরা বলব, এটি একটি যুক্তিসঙ্গত আপত্তি এবং এর সমাধান হওয়া জরুরি। যেসকল আলেম শাসকদের তাকফীর করে না আল কায়েদা তাদের সবাইকে ঘৃণা করে না; বরং তাদের নিকট যারা তাকফীর করে না তারা দুভাগে বিভক্ত-

(ক) রাজদরবার থেকে দূরে থাকা আলেমগণ। তারা শাসকশ্রেণী থেকে দূরে থাকে। তারা নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে তাকফীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি এবং তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না। এ শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম আল কায়েদার নিকট সম্মানিত। তাদের ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে।

(খ) যেসব আলেম শাসকদের তাকফীর করে না এবং মুজাহিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে। তারা মুজাহিদদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে এবং তাগুতদের প্রশংসা করে। আলেমদের এ শ্রেণীর ব্যাপারে আল কায়েদা সতর্ক করে থাকে। কারণ তাদের মাধ্যমে উম্মাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর কায়েদা বিচক্ষণ আলেমদের পথের পথিক। তাদের পন্থা হল- শর্ত পূরণ এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সাথে সাথে (যখন প্রয়োজন হয়) কুফর ও কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা। কুফরি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করল কিন্তু কাফেরদের থেকে করল না-এটা আলেমদের পথ নয়। সুতরাং হে ঐ সমস্ত ভাই, যারা শাখাগত বিষয়ে আল কায়েদার ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করো! ইতিহাসে কি এমন সময় যায়নি যখন উলামায়ে কেরাম উপযুক্ত ব্যক্তিদের কুফরীর হুকুম দিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন, তাকফির ও কিতালের মাসআলায় সত্যান্বেষীদের জন্য আপত্তি নিরসনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা' সংগঠিত হওয়া, তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করা এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করা। ইসলামী ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম কিতাল যা মুসলিম দাবিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত আলেমদের থেকে প্রকাশিত ঘটনাবলীর মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুস্পষ্ট ঘটনা। ইমাম আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল রহ. বলেন, জাহেল ও ইতর শ্রেণীর জন্য যখন শরীয়তের আদেশাবলী কঠিনসাধ্য হয় তখন তারা শরীয়তের বিধান থেকে সরে আসে এবং নিজেদের রচিত জীবনব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে তা তাদের জন্য সহজবোধ্য হয় কেননা এখন তারা অন্যের বিধানের অধীনস্থ হয়নি। এভাবে বিধান রচনার কারণে তারা আমার নিকট কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন কবরকে সম্মান করা, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রয়োজন পূরণের কামনা করা, লাত ও উজ্জাতের পূজারীদের অনুসরণ করা। (মুফিদুল মুস্তাফিদ ফী কুফরী তারিকিত তাওহীদ, ২৬)

এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট স্থান হল- 'এভাবে বিধান রচনার দরুন তারা আমার নিকট কাফের্'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. কবর পূজাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন, এই মুশরিকরা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাদের মাঝে কিছু সীমালঙ্ঘনকারী উক্ত বিষয়ে কিতাব সংকলন করেছে যার নাম দিয়েছে 'মানাসিকুল মাশাহিদ'। প্রকাশ থাকে যে তাদের এই কাজ ইসলামকে ত্যাগ এবং মূর্তিপূজার ধর্মে প্রবেশের নামান্তর (ইগাছাতুল লাহফান, ১/১৯৭)

এখানে ইবনুল কায়্যিম রহ. ইবনুল মুফীদ নামক এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করেছেন। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, তার বক্তব্য কতটা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তাকফীরে মুআইয়ান বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের তাকফীরকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? আমরা তাকফীরের ক্ষেত্রে ইমামদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি-

হানাফী

এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য অত্যন্ত কঠোর। এমনকি তারা মুসাইহিফ, মুসাইজিদ বলা ও অযু ছাড়া নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও তাকফিরে মুআইয়ান করে থাকে। আন নাহরুল ফাইক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শায়খ কাশেম শরহে দুরারিল বিহারে বলেন, সাধারণ মানুষ যেসব মান্নত করে থাকে যেমন- সৎ মানুষদের কবরে এসে ডাকা যে, হে সম্মানিত, যদি আমি হারানো বস্তু ফিরে পাই কিংবা আমার রোগ ভালো হয়ে যায় তাহলে আমি আপনার জন্য স্বর্ণ-রূপা, মোমবাতি, তেল ইত্যাদি দান করব। বেশ কিছু কারণে এসব মান্নত সকলের ঐক্যমতে বাতিল..... একটি কারণ হচ্ছে এই ধারণা করা যে, মৃত ব্যক্তি কার্য সম্পাদন করতে পারে। এই বিশ্বাস কুফর।....মানুষ এতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে শাইখ আহমদ আল বাদাভীর জন্মের ক্ষেত্রে। লক্ষ্য করুন, এখানে মানুষ ব্যপকভাবে তাতে লিপ্ত হলেও স্পষ্টভাবে তাকফীর করেছে।

আবুল আব্বাস রহ. বলেন, ইবনুল খুদাইরী তার পিতা শায়খ খুদাইর _যিনি সে যুগে হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন_তার থেকে বর্ণনা করেন, 'ইবনে সিনার ব্যাপারে বুখারার ফুক্বাহায়ে কেরামের বক্তব্য ছিল- সে বুদ্ধিমান কাফের।' ইবনে সিনাকে বোখারার ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তাকফীরের ঘটনা সে যুগের হানাফী মাযহাবের ইমাম বর্ণনা করেছেন অথচ ইবনে সিনা এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মুসলমান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এটা ছিল তাকফীরে মুয়াইয়ান।

মালেকী

তাকফিরের ব্যাপারে মালেকীদের বক্তব্য তো আরো সুস্পষ্ট ও অগণিত। মালেকী ফুকাহাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তারা সেই ব্যক্তিকেও অতিদ্রুত হত্যার ফতোয়া দিতেন যে এমন বাক্য উচ্চারণ করত মানুষ যা বোঝে না। কাজী ইয়ায রহ. "আশ-শিফা" গ্রন্থের শেষে এমন বেশ কিছু ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি সম্মানার্থে গাইরুল্লাহর নামে কসম করবে সে কাফের হয়ে

যাবে। অথচ এসব বিষয় আমাদের তাকফীরের কারণগুলোর চেয়েও নিম্নতর ও সামান্যতম।

শাফেয়ী

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহুল আরবাঈন গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, **اذا سالت فاسال الله** 'তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও'- এর মর্মকথা হল- যে গাইরুল্লাহর কাছে চাইবে, তাকে ডাকবে সে কাফের। (আল বালাগুল মুবীন, ১/২২৫)

এমনকি তিনি এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করেছেন, যার নাম হল **الإعلام بقواطع الإسلام** সেখানে তিনি এমন কিছু কথা ও কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং তাকফীরে মুআইয়ানের উপযুক্ত হয়ে যায়। অথচ সেগুলো গুরুত্বের বিচারে আমাদের আলোচিত বিষয়ের (হাকিমিয়্যাহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, মুযাহারা) দশ ভাগের এক ভাগেরও সমান হবে না। এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তাকফিরের ব্যাপারে আপত্তি দূর করতে এবং বিশ্বাস দৃঢ় করতে সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয় হল আহলে ইসলামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন আচরণ। যেমন বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারাআ রা.কে পতাকাসহ এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন _যে নিজ পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে_ যেন তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সম্পদ নিয়ে নেন। এমনিভাবে বনু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের অভিপ্রায়। কারণ তাদের বিরুদ্ধে যাকাত প্রদানের অস্বীকৃতির অভিযোগ ছিল। অনুরূপ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর সিদ্দিক রা. ও সাহাবাদের কিতাল, তাদের সন্তানদের বন্দি করা, তাদের সম্পদ গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দেয়া।

এমনিভাবে ওমর রা. এর যুগে কুদামাহ ইবনে মাযউন ও তার সাথীদের তাকফীরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। কারণ তারা নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য মদের বৈধতা সাব্যস্ত করেছিল। আয়াত-

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا

যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে এরূপ লোকদের উপর তাতে কোন গুনাহ নেই, যা তারা পানাহার করেছে; যদি তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে। পুনরায় আল্লাহকে ভয় করতে থাকে এবং ভাল কাজ করতে থাকে। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৩)

এরপর হযরত ওসমান রা. এর জামানায় ওইসব আহলে মসজিদের তাকফীরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যারা শুধুমাত্র মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের নবুওয়াতের ব্যাপারে কথা বলতো কিন্তু তার অনুসরণ করত না সাহাবায়ে কেরাম শুধুমাত্র তাদের তওবা কবুলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছিলেন। (তাকফিরের ব্যাপারে নয়।)

এমনিভাবে আলী রা. কর্তৃক তার সাথীদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া। কারণ তারা আলী রা. এর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল। পরবর্তীতে মুখতার ইবনে আবু ওবায়দা এবং তার অনুসারীদের কুফরের ব্যাপারে বাকি সাহাবীদের সাথে তাবেঈনদের ইজমা। যদিও সে দাবি করত যে, সে হুসাইন ও আহলে বাইতের রক্তের মূল্য চায়।

অনুরূপ জা'দ ইবনে দিরহামকে হত্যার ব্যাপারে তাবেঈনদের ইজমা। অথচ সে ভালো আলেম ও প্রসিদ্ধ দ্বীনদার ছিল। এ ধরনের বহু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী পরবর্তী কেউই তো আবু বক্কর ও অন্যান্যদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করেননি যে, কিভাবে আপনি বনু হানিফের সাথে জিহাদ করবেন, তারা তো কালিমা পড়ে, নামাজ পড়ে, যাকাত দেয়?! এমনিভাবে কুদামা ও তার সাথীরা যখন তাওবা করে নি তখন তাদের তাকফীরের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করেনি! এরপর বনু ওবায়দা যারা পাশ্চাত্য মিশর ও শামসহ একাধিক অঞ্চলে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করত, জুমার নামাজ ও জামাত কায়েম করতো, কাজী ও মুফতি নিয়োগ করতো; তথাপি যখন তারা জঘন্য সব কথাবার্তা ও কাজকর্ম প্রকাশ করেছিল তখন কোন আলেম তাদের সাথে কিতালের

ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি। এমনকি তারা বিরতও থাকে নি। অথচ সে যুগে ছিল ইবনুল জাওযীর মতো ব্যক্তিবর্গ। তাদের থেকে মিশর দখল করার পর ইবনুল জাওযী একটি কিতাবে লিখেন, যার নাম ছিল النصر على مصر (মিসর বিজয়।) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই উক্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করেননি। তাদের ইসলামের দাবী, কালিমা পাঠ কিংবা ইসলামের কিছু রুকন পালনের দরুন কোন আপত্তিও আসেনি। কেবলমাত্র বর্তমান যুগের কতিপয় অভিশপ্ত শয়তান থেকে শোনা যাচ্ছে যে, এসব কুফর ঠিকই। কিন্তু যে ব্যক্তি তা সম্পাদন করবে কিংবা ভালো মনে করবে বা তার সাথী হবে বা তাওহীদকে ঘৃণা করবে অথবা তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাওহীদের কারণেই বা তাদেরকে ঘৃণা করবে তাকে তাকফির করা যাবে না। কারণ সে কালিমা পাঠ করে, ইসলামের পাঁচ রুকন আদায় করে। এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেই ইসলাম বলেছেন। এমন জঘন্য কথা বর্তমান যুগের মুলহিদ কাফের ছাড়া অন্য কারো থেকে শোনা যায় না। যদি তারা এ ব্যাপারে আলেমদের থেকে একটি অক্ষরও কিংবা একজনকেও দেখাতে পারে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অসার দাবির দলিল দাঁড় করাতে পারে তাহলে সেটা তারা উল্লেখ করুক। (মুফিদুল মুস্তাফিদ ফী কুফরি তারিকিত তাওহীদ, পৃ. ৩৬)

শায়খ নাসির আল ফাহাদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু) এমন ১৪ টি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে উলামায়ে কেরাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা কারীকে তাকফীর করেছেন।

মূলত ঘটনা এই দাঁড়ালো যে- খারেজী আদর্শকে খণ্ডনের জন্য ইরজার চেতনা প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। অর্থাৎ এক বিদআতের মোকাবেলায় আরেক বিদআত দাঁড়িয়ে গেল। আর আহলে সুন্নাহ মুরজিয়া ও খারেজীদের মধ্যবর্তী পথ ঈমানকেই অবলম্বন করল।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা, তুমি সতর্ক হও। তোমার আবেগ যেন দ্বীনের বিরুদ্ধে না যায়, যার ফলশ্রুতিতে তুমি উপযুক্ত ও যথার্থ তাকফীরের বিরুদ্ধে লড়ছ আর তুমি তা অনুভবই করতে পারছ না! এমন কি তুমি মানুষের সামনে কুফরকে সামান্য করে তুলছো ফলে তারা কুফরের কদর্যতায় লিপ্ত হচ্ছে আর সেটাকে কুফর না ভেবে শুধু গুনাহ মনে করছে।

হে আল্লাহর বান্দা, তুমি মুরজিয়াদের মাযহাব প্রচারে সতর্ক হও! এমন যেন না হয় যে, তুমি মুরজিয়াদের মাযহাব প্রচার করছো আর তুমি মনে করছ আমি আহলে সুন্নাহর মাযহাব প্রচার করছি।

নাযর ইবনে শামীল রহ. বলেন, আমি খলীফা মামুনের দরবারে গেলাম। খলীফা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, ভালো আছি আমিরুল মুমিনিন! অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি কি জানো ইরজা কাকে বলে? আমি বললাম, ইরজা হল এমন দ্বীন যা বাদশাহর অনুগামী হয়, যা দ্বারা তারা দুনিয়া অর্জন করে আর আখেরাত ধ্বংস করে। তিনি বললেন, সত্য বলেছ। (তারিখু মাদিনাতি দিমাশক, ৩৩/২৮৬)

অন্য জায়গায় আছে, নজর ইবনে শামীল রহ. বলেন, খলিফা মামুন আমাকে বললেন হে আবুল হাসান, ইরজা হলো রাজা-বাদশাদের ধর্ম। আলহামদুলিল্লাহ- আকিদাগত বিষয়গুলোতে আল কায়েদা আহলে সুন্নাহর মানহাজের উপর রয়েছে। বিশেষ করে ঈমান, আসমা ও সিফাত, তাকদীর, কোরআন ও সাহাবা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তারা আহলে সুন্নাহর মানহাজ অনুসরণ করে।

তুমি কি দেখেছ কুফর নয় এমন পাপের কারণে আল কায়েদা কাউকে তাকফীর করেছে? তারা কি যিনাকারী হত্যাকারীর মত অন্যান্য পাপাচারীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহর আকীদা পোষণ করে না? মুসলিমদের হত্যা করা আর মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দেয়া কি খারেজীদের বৈশিষ্ট্য নয়? বর্তমানে আল কায়েদাই সবচেয়ে বড় জিহাদী তানজীম যারা মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। মাথা মুণ্ডানো কি খারেজীদের বৈশিষ্ট্য নয়? অথচ আল কায়েদার অধিকাংশই লম্বা চুলে অভ্যস্ত।

১৫. যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের কারণে

যুদ্ধসংশ্লিষ্ট হাদিস সমূহে তিনটি স্থানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে:

১. শাম।

২. খোরাসান।

৩. আদনে আবীন।

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত হও:

একটি বাহিনী শামের,

একটি বাহিনী ইয়েমেনের

আর আরেকটি ইরাকের।”

ইবনে হাওয়ালাহ (রা.) বললেনঃ ‘হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি বাহিনী নির্ধারণ করে দিন।’ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,“তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে, কারণ এটি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জমীন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে! আর যদি তুমি তা না চাও তবে তোমার ইয়ামানে যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সিরিয়া এবং তার মানুষের উপর খেয়াল রাখবেন!” (ইমাম আহমদ ৪/১১০, আবু দাউদ ২৪৮৩)

এই স্থানগুলোর আজকের অবস্থাকে দুই দশক পূর্বেকার অবস্থার সাথে তুলনা করলে পুরোই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই দেশগুলোর অবস্থা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে। শাম বিশ বছর পূর্বেও বর্তমানের তুলনায় দ্বীন থেকে অনেক দূরে ছিল। খোরাসান ছিল সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসিত। আদনে আবীনের অবস্থাও একই রকম ছিল। কিন্তু এখন আল্লাহর রহমতে খোরাসানে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় জিহাদী দুর্গটির অবস্থান। শামেও চলছে জিহাদী বিপ্লব। আদনে আবীনেও শুরু হয়েছে ইসলামী জাগরণ। অচিরেই ইনশাআল্লাহ এসকল স্থানে মুজাহিদগণের হাতে ইসলামের অনেক বিজয় সূচিত হবে। উল্লিখিত স্থানসমূহে আল কায়েদার রয়েছে সরব উপস্থিতি। খোরাসান তো আল কায়েদার কেন্দ্রভূমি এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. সেখানেই আছেন। আদনে আবীনে সবচেয়ে বড় জিহাদী যে সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে তা হলো আল

কায়েদা। শামেও আল কায়েদার অনেক শাখা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গাজায় তাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং এসব স্থানে বিজয়ের শুভ লক্ষণ প্রতিভাত এবং জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলনের কারণে ইসলামের বিজয় অত্যাসন্ন।

পরবর্তী পর্বগুলোও শীঘ্রই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ.... নেক দুআয় ভুলবেন না....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৪৪

একটু প্রস্তুতি

Khalji-The-Seventeen

Member

০৮-২২-২০১৯

একজন মুজাহিদের প্রাথমিক প্রস্তুতি

শুরু করছি মহান আল্লাহ তা'আলার নামে, শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল্লাল্লাহ (সঃ) ও উনার পরিবারের উপর এবং উনার মনোনীত সাহাবা (রাঃ) এর উপর, এবং যারা উনার প্রদর্শিত পথে অনুসরণ করে কেয়ামত পর্যন্ত।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এ ছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমারা জাননা; কিন্তু আল্লাহ জানেন; আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবে না।"(আল-আনফালঃ ৬০)

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো, তবে এর কিছু আসবাবপত্র তো প্রস্তুত করতো; কিন্তু আল্লাহ তাদের (যুদ্ধে যাওয়ার জাগরণকে) যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্যে তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং বলে দেয়া হলো, "তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।"(আত-তাওবাঃ৪৬)

সুরা আল-আনফালের আয়াত অনুযায়ী, এটাঃ

১ – প্রতিষ্ঠিত করে যে প্রস্তুতি হচ্ছে একজন ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী এবং তার সামর্থ্যের বাহিরে নয়। এবং এটা হচ্ছে শরয়িহ দায়িত্ব, অতএব মুসলিম শক্তি বর্ধন করবে অস্ত্রের ব্যবস্থা করবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী।

২ – যুদ্ধের শক্তি এবং দৃঢ়প্রত্যয়। এই উপলব্ধির মাত্রা নির্দেশ করে সকল ধরনের হাতিয়ার, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং যোগাযোগ এবং যানবাহনের। রাসুলাল্লাহ (সঃ) এই হাদিসের মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন, 'কার্যত, ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যেই রয়েছে শক্তি', তিনি (সঃ) এটা তিনবার বলেছেন। কোরআন সকল মুসলিমকে নির্দেশ করেছে অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য এবং এই ব্যাপারে উদাসীন হতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেনঃ

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

"এবং যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক, তখন তাদের জন্যে (নামাজে ইমামত করবে) নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর, যেন তাদের একদল তোমার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং স্ব-স্ব অস্ত্র গ্রহন করে; অতঃপর যখন সিজদাহ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয় এবং অন্য দল যারা পড়েনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে নামাজ পড়ে এবং স্ব-স্ব সতর্কতা ও অস্ত্র গ্রহন করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয় এবং তাতে তোমাদের অপরাধ নেই— যদি তোমারা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় সতর্কতা অবলম্বন কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।"(সূরা-নিসাঃ১০২)

৩ – এই আয়াত এটাই পরিষ্কার করে যে প্রস্তুতির দায়িত্ব কেবল জ্ঞান অর্জন, অনুশীলন করা এবং এগুলোর মত অন্যান্য কিছু করা নয়, এটা এমন একটা আইডিয়া যেটা সম্প্রতিকালে ছড়িয়ে পড়ে, যে প্রস্তুতি হচ্ছে ছুটির দিনে কোন

অভিপ্রায় ছাড়া জিহাদের লড়াইয়ে অংশগ্রহন করা। প্রস্তুতির রয়েছে এক বিশেষ লক্ষ্য... {وُ} তৈরি করা...

ﭙ ﭚ ﭛ এর মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রু এবং অন্যান্যদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করা, এবং এটা আমি আগেও উল্লেখ করেছি।

৪ – তারপর, এই আয়াত একটা সতর্ক নির্দেশনা নির্দেশ করে এর উপর ব্যয় করতে প্রস্তুতি এবং হাতিয়ার এবং যুদ্ধ সামগ্রী ধারনের জন্য, কারণ আল্লাহ জানেন এর মূল্য, এবং বেশীর ভাগই যারা জিহাদে লড়াই করতে ইচ্ছুক তারা এই পর্যন্ত পৌছতে অকৃতকার্য হয়। অতএব এই আয়াত আদেশ করে এবং শেষ করে এর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতে এবং আল্লাহ এটার জন্য ওয়াদা করছে প্রচুর পুরষ্কারের।

সূরা তাওবাহের আয়াত অনুযায়ী, এটাঃ

প্রস্তুতি এবং ইমানের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ধারন করে মহান নির্দেশনাবলী এবং মহান ফিকহ এবং এর সম্পর্কের সাথে ব্যাবহারিক জিহাদের, এবং নিম্নের নির্দেশনা থেকেঃ

এই আয়াত মুনাফিকিনদের ব্যাপারে পরিষ্কার করে এই আয়াতের দাবী হচ্ছে জিহাদের জন্য একটা আকাঙ্খা থাকতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর পরে ব্যাখ্যা করা হয় ইমানদার এবং তাদের সম্পদ ও আত্মত্যাগের সাথে লড়াইয়ের সম্পর্ক এবং জিহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন বাতিল করা, যেটা মুনাফিকিনরা করে থাকে জিহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার, যাদের অন্তর দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকে এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা অনুমোদন খোঁজে। (এবং এই কারনে, সূরা আত-তাওবাহর পরিচ্ছেদকে বলা হয় "মুনাফিকিনদের মুখোশ উন্মোচনকারী"।) উপরে উল্লেখিত আয়াত প্রতিপাদ করে যে এটা মুনাফিকিনদের একটা মুনাফিকির আলামত যেটা হচ্ছে তারা লড়াই এবং জিহাদের প্রস্তুতি থেকে বিমুখ থাকে, এবং তাদের ব্যাপারে বলা হয় ﭐ ﭑ ﭒ 'আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো', অথবা যদি লড়াইয়ের জন্য তাদের দৃঢ়তা থাকত এবং বের হওয়ার জন্য

আন্তরিক হত, ৎ ে ঃ তবে এর কিছু আসবাবপত্র তো প্রস্তুত করতো, অথবা তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুত রাখত, এছাড়াও এটা পরিষ্কার করে যে আল্লাহ সুবহানা তাআলা তাদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হতে বিমুখ রেখেছে, এবং তাদেরকে পেছনেই স্থগিত রাখে কারণ তিনি তাদের অবস্থা জানেন, এবং তাদের বসে থাকাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রাখেন, মুজাহিদিনদের মঙ্গলের জন্য, কারন তাদের অগ্র যাত্রা মুজাহিদিনদের যন্ত্রণা এবং বিশৃঙ্খলার কারণই হবে। চলুন আমরা আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাই, যেটা হচ্ছে জিহাদ এবং প্রস্তুতির মধ্যে সম্পর্ক। অতএব এই আয়াত নির্দেশ করে আল্লাহ তাআলার বানীর এই স্তরের দিকেঃ

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো, তবে এর কিছু আসবাবপত্র তো প্রস্তুত করতো; কিন্তু আল্লাহ তাদের (যুদ্ধে যাওয়ার জাগরণকে) যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্যে তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং বলে দেয়া হলো, "তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক"। (আত-তাওবাঃ৪৬)

এই আয়াতের শিক্ষা হতে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে তিনটি স্তর রয়েছেঃ

'ইচ্ছা' ... 'প্রস্তুতি' ... এবং 'অভিগমন'...

এই ডাইনামিক এবং যৌক্তিক বিন্যাস অপারেশানগত মেকানিজম সংক্ষেপণ করে জিহাদ এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রদর্শনে।

১ – ইচ্ছাঃ লড়াইয়ের জন্য ইচ্ছা পোষণ হচ্ছে প্রস্তুতির পূর্বসূচক, এবং পরবর্তীতে জিহাদঃ

সকল মিলিটারি স্কুল একমত যে **লড়াইয়ের ইচ্ছা** এবং **যোদ্ধার নৈতিক শক্তিমত্তা হচ্ছে** বিজয়ের জন্য ভিত্তি এবং কৃতিত্ব। এছাড়াও, ইচ্ছা হচ্ছে সকল কর্ম এবং মানুষের সকল প্রত্যাশিত কার্যক্রমের ভিত্তি।

যেকেউ খেতে, পান করতে, বিয়ে করতে, ব্যবসা করতে, ভ্রমন করতে অথবা যেকোনো কিছু করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সেটা শুরু করতে হবে আন্তরিক ইচ্ছার

সাথে। এই ইচ্ছার আন্তরিকতার প্রমান হচ্ছে যে সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহন...

আমাদের অবস্থানে, যেটা হচ্ছে জিহাদ... প্রস্তুতি হচ্ছে আন্তরিক ইচ্ছার ফল। যখন ইচ্ছা হচ্ছে আন্তরিক এবং সংকল্প হচ্ছে দৃঢ়, কেউ তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করে, আল্লাহর শত্রু এবং মুসলিমদের শত্রুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে... প্রস্তুতির পরে, তাকে ময়দানে প্রেরণ করা হয়... সুতারাং, যদি আকাঙ্খা আন্তরিক হয় এবং প্রস্তুতি নেয়া হয় তার সামর্থ্য অনুযায়ী, জিহাদের জন্য একক যাত্রা শুরু করে যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানা তাআলা তাকে পেছনে রুখে দেয় বিশৃঙ্খলার এবং ক্ষতি হওয়ার কারনে [সে কারণ হতে পারে], এবং যতক্ষণ না সে শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা তার নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় ভীরুতা এবং দুর্বলতার কারনে, রাসুলাল্লাহ (সঃ) যেটা বলেছেনঃ 'দুনিয়ার জন্য ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা' – আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি উত্তম পরিস্থিতির জন্য এবং ধৈর্য ধারণের।

এই লড়াইয়ের ইচ্ছা হচ্ছে প্রস্তুতি এবং কাজের উদ্দীপনা। যদি এটা একজন রেগুলার সৈনিকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ভিত্তি হয়, তাহলে এটা হচ্ছে সার্বিকভাবে গেরিলা ফাইটারদের এবং বিশেষ করে জিহাদি প্রতিরোধ ফাইটারদের জন্য মূল ভিত্তি। তদুপরি, এটা হচ্ছে তার বেসিক হাতিয়ার, যেটা তাকে সামনের দিকে নিয়ে যায় যেকোন কিছুই সে করতে সক্ষম হয়, এমনকি বেসামরিক হাতিয়ারের ব্যাবহার, যদি সেখানে এছাড়া কোন ধরনের সামরিক অস্ত্রের যোগান না থাকে।

দ্বিতীয় অংশ

ঘরের মধ্যে ট্রেনিং এর কসরতের সময় মিলিটারী প্রস্তুতিকরন হচ্ছে তুলনামূলক নিম্নস্তরের, কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে উচ্চ মানের, যদি এটা করা হয় গোপন অবস্থানের ভিত্তিতে এবং বিশেষ নিরাপত্তার পুর্বসতর্কতার ব্যবস্থা অনুযায়ী।

● ইনহাউজ এবং সিক্রেট মোবাইল ক্যাম্পে ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য সংক্ষিপ্ত আইডিয়াঃ

যদি আল্লাহ এটাকে সহজ করে দেয়, গেরিলা ওয়ারফেয়ারের জন্য কিছু মিলিটারি সায়েন্সের প্রয়োজনে

আমরা চেষ্টা করব প্রতিরোধ লড়াইয়ের গবেষণা গ্রন্থে বিস্তারিত পাঠের উপর প্রোগ্রামসহ একটা মিলিটারি এটাছমেন্ট সংযোগ করতে, বিশেষ করে শহুরে এবং সিক্রেট প্রোগ্রাম, যেটা বর্তমান পরিস্থিতির উপর প্রতিরোধ ব্রিগেডের অপারেশানগত কার্যক্রমের জন্য একটা ভিত্তি। প্রোগ্রাম গঠন হবে লাইট উইপন্স, উইপন্সের শুটিং দক্ষতা, বিস্ফোরক বিদ্যা এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিসিটি এবং ইলেকট্রনিকসের ব্যাবহারের মধ্যমে...এবং কিছু শহুরে গেরিলা ওয়ারফেয়ারের কলাকৌশল, ইনশাআল্লাহ।

এখন, যাইহোক, আমি একটা ছোটখাটো প্রোগ্রামের দিকে নির্দেশনা করবো যেটা বাস্তবায়ন করা যাবে সবচেয়ে সিম্পল সেলগুলোর মাধ্যমে, এটাকে প্রতিরোধ লড়াইয়ের জন্য স্থির করা হয়েছে নিরাপত্তার এবং গোপনীয়তার সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির জন্য নির্ভর করে।

▪ যে এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হবে সে নিজেকে এবং যাদের সে তার সাথে অন্তর্ভুক্তি করতে চায়, তাদেরকে একটা শারীরিক ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে, কোন স্পোর্টস ক্লাবে যোগ দেয়ার মাধ্যমে সেখানে সে শিখতে পারে রেস্লিং, কারাটে, জুডো... বক্সিং... ইত্যাদি... অথবা ব্যক্তিগতভাবে ডেইলি ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা হতে পারে দীর্ঘ পথ এবং দীর্ঘ সময় ধরে দৌড়ানো এবং এমন ফিজিকেল এক্সারসাইজ স্পোর্টসে অভ্যস্ত হওয়া যাতে শক্তিশালী ফিটনেস তৈরি হয়।

▪ কিভাবে রিভলভার এবং মেশিনগান ডিসএসেম্বল এবং এসেম্বল করতে হয় সেটার পাঠ, এগুলোর মেনুয়েল ব্যবহার এবং এগুলোর বিভিন্ন পার্ট এবং বিশেষত্বের বিশ্লেষণ, এগুলোর শুটিং এবং শুটিং পজিশান কিভাবে করতে হয় তার পাঠ।

▪ পাখী শিকার করার রাইফেল দিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করা যেতে পারে যেটা সব জায়গায় সহজলভ্য।

▪ হ্যান্ড গ্রেনেড তৈরির একটা থিওরিকেল পাঠ, করা যেতে পারে মেনুয়েলি শিক্ষার মাধ্যমে, এবং সেগুলো নিক্ষেপ করার পদ্ধতি শিখতে হবে, নিক্ষেপের প্র্যাকটিস করা যেতে পারে গ্রেনেডের সাইজ এবং ওজনের কোন বস্তুকে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে।

▪ বিস্ফোরক তৈরির একটা থিওরিকেল পাঠ, এবং এর উপরকরনগুলোর সংরক্ষণ এবং ব্যাবহার। একজন শিক্ষার্থী আসল দ্রব্য ব্যাবহার না করে সামঞ্জস্য কিছু ব্যাবহার করবে, কাঠের দ্রব্য, ক্যাবল এবং প্লাস্টিক মডেল, ডেটনেটরের পরিবর্তে ইলেকট্রিক তার কানেক্ট করা ল্যাম্প এবং বাল্বের ব্যাবহার বিধি শিখা নমুনা হিসেবে। আমরা এই পদ্ধতি এর আগে প্র্যাকটিস করেছি এবং সফলতা পেয়েছি। বিস্ফোরক তৈরির ৪০ ঘণ্টার একটা থিওরিকেল কোর্সের ব্যবস্থা করেছিলাম যেটার প্র্যাকটিস হয়েছিল কাঠ এবং প্লাস্টিক মডেল দিয়ে, শিক্ষার্থীকে এই প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল তারা আসল বিস্ফোরক তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠা পর্যন্ত এবং কেবল একটা জিনিস বাকী ছিল সেটা হচ্ছে সঠিক জায়গায় এর বাস্তবায়ন খুব ছোট বম্ব দিয়ে।

▪ ওয়ারলেস ডিভাইস ব্যাবহারে পারদর্শিতা এবং এটার ব্যাবহারের নিরাপত্তার উপর একটা মেনুয়েল শিক্ষা, প্রাইভেট হাউজে এগুলো ব্যাবহার এড়িয়ে চলা, কিন্তু কেবল খালি জায়গায় ব্যাবহার করতে পারবে, এবং ট্রান্সমিশানের সময় আধা মিনিটের বেশী হবেনা এতে করে ফ্রেকুয়েন্সি মনিটরের আওতায় আসবেনা এবং কথাবার্তার ধরন সরকারী এজেন্সিগুলোর কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

▪ থিওরিকেল শিক্ষা যেটা অন্তর্ভুক্ত করবে নিম্নের মিলিটারি এবং টেক্টিকেল বিষয়গুলো, মেনুয়েলি করতে হবে যেগুলো এখন অনুরূপ ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেনুয়েল যেগুলো হচ্ছেঃ

- লাইট এবং মিডিয়াম ধরনের উইপন্সের উপর মেন্যুয়েল।

- এক্সপ্লসিভ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের উপর মেন্যুয়েল।

- সামরিক ভুসংক্রান্ত বিজ্ঞানের উপর মেন্যুয়েল।

- ওয়ারলেস এবং এর কথাবার্তা এনকোডিং সায়েন্সের উপর মেন্যুয়েল।

- সিকিউরিটি এবং মুভমেন্ট, সিক্রেট একশান, শত্রুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে পশ্চাদ্ধাবন এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ফলে টার্গেটে পরিণত থেকে লুকিয়ে থাকা এবং পালিয়ে যাওয়ার উপর মেন্যুয়েল।

- ইলেক্ট্রিসিটি এবং ইলেকট্রনিক সায়েন্সের উপর মেন্যুয়েল, এবং যেগুলোর সাথে এক্সপ্লসিভ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের সম্পর্ক রয়েছে।

- এক্সপ্লসিভ এসেম্বলিং এবং প্রস্তুতির উপর মেন্যুয়েল **(বাস্তবায়নের জন্য সরবরাহ করা হবে একজন কেমিস্ট্রি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে, এবং এটা করতে হবে জনবহুল এলাকা থেকে দূরে এবং স্বল্প পরিমানে)।**

- যুদ্ধকৌশলের উপর মেন্যুয়েল, শহুরে ওয়ারফেয়ারের যুদ্ধকৌশল – পাহাড়ি ওয়ারফেয়ার – বন্য ওয়ারফেয়ার – গেরিলা ওয়ারফেয়ার – রেগুলার আর্মির যুদ্ধকৌশল এবং রেগুলার আর্মির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার পদ্ধতি...ইত্যাদি...

- সিক্রেট পরিচালনার উপর মেন্যুয়েল,সাক্ষাৎকার সেট করা, সিক্রেটলি বার্তা পাঠানো এবং গ্রহন করা... ইত্যাদি...

এই মিলিটারি শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা সম্ভব হবে কম্পিউটার ডিস্ক দ্বারা সরবরাহ করতে, এটাকে হস্তান্তর করা, এটা থেকে সুবিধা অর্জন করা এবং একটি নিবিড় প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিখানো যাবে, এবং ঘরের মধ্যে অনেক কার্যকরী প্রেক্টিকেল এক্সারসাইজ চালানো যাবে অথবা স্পোর্টস এবং স্কাউট ক্যাম্প অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা চালানো যাবে। অতঃপর কেবল বাকী রইল শুটিং প্র্যাকটিস এবং বিস্ফোরকের ব্যাবহার। এটা করা যেতে পারে একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করে, এবং এটা করতে হবে বিশেষ সময়ে, অথবা মোবাইল সিক্রেট ক্যাম্পে করা যেতে পারে, অথবা যেভাবে সম্ভব হয়... এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি ব্যবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা যখন এই ট্রেনিং পরিচালনা করা হয়। এবং একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন সফলতা দানকারী।

ক্যাম্প, নিরাপত্তা এবং সময়ঃ

ক্যাম্প, এটা অবশ্যই হবে আপনার একমাত্র ব্যাড রুম এখান থেকে এক ইঞ্চি বাহিরে অন্য কোথাও নয়, আপনার যেটা আছে সেখানেই। আপনি যদি রুমে একা থাকেন তাহলে সেটা হবে অসাধারণ, আর যদি আপনার রুমমেট হয় আপনার বন্ধু

অথবা আপনার ভাই, সে যদি আপনার হাম খেয়াল হয় তাহলে সেটা হবে ওয়াও। আর যদি না হয় চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই একা রুমের ব্যবস্থা করতে। যদি বিবাহিত হন আপনার স্ত্রীকে মেনেজ করতে হবে, তাকে বুঝাতে হবে আপনি ফিটনেসের ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছেন। তবে তাকে কিছুতেই বুঝাতে দেয়া যাবে না, ইউ বিকামিং এ সোলজার। এভাবে পরিবারের বাকি সবাইকেও। বিশেষ করে শিশুদেরকে কিছুই বুঝতে দেয়া যাবে না। সেদিন দেখলাম পাশের বাড়ির এক বাচ্চাকে তার স্কুল থেকে বলা হয়েছিল বাড়ি থেকে দুইটা যেকোনো ইসলামি বই নিয়ে আসতে। আমি বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বই দিয়ে সারেরা কি করবে, সে বলল তারা এইগুলো স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্য সংগ্রহ করতেছে, দেখুন কি মারাত্মক তাগুত কিভাবে আপনার ঘরের তথ্য সংগ্রহ করতেছে। আপনি যখন পরিপূর্ণ প্র্যাকটিস শুরু করবেন, আপনার মাঝে কিছুটা হলেও এর প্রতিফলন ঘটবে, যদি আপনার আশপাশের লোকদের মাঝে কিছুটা বহিঃপ্রকাশ পায়, তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়াটা বোঝাতে হবে আপনি ইদানিং বডি ফিটনেস, রেসলিং এবং বডি বিল্ডিং এগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তবে ধীরে ধীরে। সময়টা নির্ধারণ করতে হবে বিশেষ করে তাহাজ্জুত নামাজের পর থেকে ফজর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা ফজরের পরে, অথবা সন্ধ্যার পরে। তবে বেষ্ট হবে আপনার নিরাপত্তার অবস্থান অনুযায়ী।

এখানে, প্র্যাকটিসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আপনি প্রথম দিন আধা ঘণ্টার জন্য করে শুরু করতে পারেন। প্রথম দশ দিন এই সময়কে ইনক্রিজ করে দুই ঘণ্টায় পরিণত করতে হবে। এরপর থেকে সর্বনিম্ন দুই ঘণ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এর চেয়েও বেশী করার যতটুকু সম্ভব আপনার সাধ্য অনুযায়ী। প্রথম দশ দিন শুধু পার্ট এক করবেন।

১ – ইনিশিয়াল ওয়ার্ম আপ ওয়ার্ক আউট

২ – ফিটনেস

৩ – মার্শাল আর্ট

- তাইকুণ্ডু বেসিক
- কিক বক্সিং বেসিক

৪ – উইপন্স

• উইপন্স রিভিও

• উইপন্স পজিশান

৫ – অন্যান্য

১ – ইনিশিয়াল ওয়ার্ম আপ ওয়ার্ক আউটঃ এখানে যে ওয়ার্ক আউট গুলো আছে, এগুলো যেকোনো ধরনের মিলিটারি লাইনের প্রাথমিক শরীরচর্চা। এগুলো আমি ইংরেজিতে দিয়েছি যাতে আপনারা শুদু লেখাটা কপি করে নিয়ে ইউ টিউবে সার্চ করবেন, সার্চ করার সময় প্রত্যেকটার লেখার আগে দিয়ে how to do লেখাটা লিখবেন, দেখবেন প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে। শুরু করার আগে এগুলোকে ডাউনলোড করে নিবেন। প্রথম দশ দিন বা পনেরো এই ব্যায়ামগুলো করবেন। প্রথম দিন আধা ঘণ্টা করবেন এরপর শেষ দিন পর্যন্ত দুই ঘণ্টায় নিয়ে যাবেন ধীরে ধীরে, প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট করে বাড়াবেন। শুরু শুরুর দিকে শরীর ব্যথা হবে, কিন্তু এর জন্য কোন পেইন কিলার নেবেন না। কি খেতে হবে আমি সেটা খাদ্য তালিকার অংশে দিয়ে দেব।

১. Jumping jacks - এটা ৫-১০ বার করবেন।

২. Half Jumping Jacks - এটা ৫-১০ বার করবেন।

৩. Windmills - এটা ৫-১০ বার করবেন।

৪. Two count Windmills - এটা ৫-১০ বার করবেন।

৫. Trunk side stretch - এটা ৫-১০ বার করবেন।

৬. close grip pull-ups - এটা ৫ বার করবেন।

৭. wide grip pull-ups - এটা ৫ বার করবেন।

৮. Behind neck pull-ups - এটা ৫ বার করবেন।

৯. Regular grip pull-ups - এটা ৫ বার করবেন।

নোটঃ ৬ – ৯ নাম্বার আপনি প্রথম দিন থেকে ৫ বার করে পারবেন না, দুইবার থেকে শুরু করতে পারেন। এগুলো ৫ – ১০ মরতবা করতে হবে। এই ব্যায়ামটা আপনার হেভি ওয়েট এক্সারসাইজ হিসেবেও কাজে আসবে। এই ব্যায়ামে যদি আপনি অভ্যস্ত হয়ে যান আপনি দেখতে পাবেন মিলিটারি কিছু ট্রেনিং আছে সেগুলো আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে। এগুলো খুবই ইউসফুল।

১০. Push ups - এটা ১০ - ২০ বার করবেন। এগুলো ৫ – ১০ মরতবা করতে হবে।

১১. Situps

১২. Cross arms situps

১৩. Flutter kicks

১৪. Cruncher situps

১৫. Atomic situps

নোটঃ ১১ - ১৫ হচ্ছে পেটের ব্যায়াম প্রত্যেকটা ৫- ১০ বার করে ৫ – ১০ মরতবা করতে পারেন।

১৬. Lizard stretch - এটা ৫-১০ বার করবেন।

১৭. Neck rotations - এটা ১০ - ১২ বার করবেন। Legs

১৮. Lunges - এটা ১০- ১২ বার করে ৫ – ৬ মরতবা করতে পারেন।

১৯. Squats - এটা ১০- ১২ বার করে ৫ – ৬ মরতবা করতে পারেন।

¬ Flexibility: এগুলো মূলত মার্শাল আর্টের জন্য, এই ফ্লেক্সিবল এক্সারসাইজগুলো বেসিক ব্যায়ামের সাথে করতে হবে প্রতিদিন। এগুলো রপ্ত করতে এই ভিডিও তিনটা যথেষ্ট আমি মনে করি। লিঙ্ক গুলো দেয়া হল, ডাউনলোড করে নিবেন সাথে সাথে।

¬ https://www.youtube.com/watch?v=aEYgYkdr৪২Y

¬ https://www.youtube.com/watch?v=v৬SdkwJpT৫w

¬ https://www.youtube.com/watch?v=qhpo৯qKxO২c

২ – ফিটনেসঃ বডিবিল্ডিংঃ ফিটনেসের ক্ষেত্রে বডিবিল্ডিং এর এক্সারসাইজ করা যেতে পারে, সেটা হতে পারে লাইট ওয়েট অথবা মিড ওয়েট, হেভি ওয়েটের আশা করি প্রয়োজন নেই, কেউ যদি আগ্রহী হয় সেক্ষেত্রে হেলথ ক্লাবে ভর্তি হতে হবে, সেটা কিছু ব্যয় বহুল। লাইট ওয়েট অথবা মিড ওয়েটের জন্য আপনি কোন স্পোর্টস সপ থেকে একটা ৩ ফুটের বার, দুইটা হ্যান্ড বার এবং ১৫ কেজি ওয়েট কিনতে পারেন, এবং একটা ৪ ফুট বাই ৩/৪ ফুটের একটা শক্ত কাঠের বেঞ্চ কিনতে পারেন। বার এবং ওয়েটগুলোর মূল্য ২০০০ – ২৫০০ টাকা হবে। আপনি এই ইন্সট্রমেন্টগুলো দিয়ে ৮০ ভাগ লাইট ওয়েট অথবা মিড ওয়েট বডিবিল্ডিং এক্সারসাইজ করতে পারবেন। biceps and triceps, chest, back, hands and legs এই এক্সারসাইজগুলো কিভাবে করতে হবে বিস্তারিত দেখানো হবে। কেউ যদি বডিবিল্ডিং এর এক্সারসাইজ করতে অনিচ্ছুক হন তাহলে পার্ট অয়ান ডাবল করে করলে বডিবিল্ডিং এর মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে। দৌড়ানোঃ সাধারণ লাইফ বলেন মিলিটারি লাইফ বলেন দৌড় হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী ব্যায়াম। আপনাকে সপ্তাহে ৫-৬ দিন সন্ধ্যা অথবা সকালে ৫-৬ কিমি দৌড়তে হবে অথবা সপ্তাহে ২ দিন ১২-১৫ কিমি হলে চলবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ দৌড়।

হার্ডশিপঃ এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার এলাকার রেলওয়ে ব্যাবহার করতে পারেন। এই জন্য আপনি নরম স্যান্ডেল অথবা নরম সোলের কেডস পায়ে ব্যাবহার করবেন, এতে করে আপনার পায়ে পাথরগুলোর আঘাত লাগবে, ফলে আপনার পায়ে স্ট্রেংথনেস বৃদ্ধি পাবে। আপনি রেললাইন ধরে দৌড়াবেন ১০-১২ কিমি সপ্তাহে দুইদিন, সপ্তাহের মধ্য ভাগে এবং শেষ ভাগে। দৌড়ানোর সময় আপনি চেষ্টা করবেন রেললাইনের কাঠের পাটাতন এড়িয়ে যেতে, শুধু পাথরের উপর। আপনি নিরাপত্তার খাতিরে দৌড়ার পরিবর্তে হাঁটতে পারেন। কারন তাগুতের কোন গোয়েন্দা বিভাগের কোন ব্যক্তির নজরে পড়লে হয়ত ব্যাপারটা সহজভাবে নেবেনা। যদি নিরাপত্তা অনুভব করেন তাহলে দৌড়াতে পারেন। উত্তম হবে শহর থেকে বের হয়ে গ্রামের দিকের রেলওয়েতে।

এছাড়া আপনার এলাকা যদি দুর্গম অথবা পাহাড়ি এলাকা হয় আপনি সেই পথ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করবেন। পার্বত্য এলাকায় ভ্রমণে গিয়ে সেটা করা যেতে পারে। কাদাযুক্ত জলাশয়ে চলার অভ্যস্ত করতে হবে। বাংলাদেশে এবং এর আশপাশে ভারতের রাজ্যগুলোর বৈরি এলাকাগুলো প্রায় একই রকম। বৈরি অবস্থা এবং আবহাওয়াতে যাতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তপ্ত রোদের মধ্যে হেটে অভ্যস্ত হওয়া, ঘন মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে ভিজে ভিজে হেটে অভ্যস্ত হওয়া, অমাবস্যার রাতে গ্রাম্য অচেনা আলো বিহীন অন্ধকার দীর্ঘ পথে হেটে অভ্যস্ত হওয়া। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এগুলোকে কিভাবে সহজে আয়ত্ত করা যায় এর উপর একটা প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা করবো। সাগরের বুকে যে কেউ চাইলে নৌকা করে যেতে পারে না ভয় এবং দুর্বলতার কারনে, কেউ সাহস করে গেলেও বমি করে দেয়। যারা সাগর উপকূলীয় অঞ্চলে বা নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন, তারা চাইলে জেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করে, ইঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মাছ ধরতে যাওয়া।

দীর্ঘ সময় ধরে সাইকেলিং করা, ৬০-৭০-৮০-৯০-১০০ কিমি যতটুকু সম্ভব সাধ্যের অতিরিক্ত সময় ধরে একটানা সাইকেল চালানো মাঝে মাঝে।

৩ – মার্শাল আর্টঃ মার্শাল আর্ট হচ্ছে খুবই কার্যকরী, গেরিলা ওয়ারফেয়ারের বা কমান্ডো স্পেশাল ফোর্সের সদস্যদের ক্লোজ কমব্যাটের ট্রেনিং করানো হয়, সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টু হ্যান্ড টেক্টিকেল কমব্যাট, যেমন, মেস্ট্রো ডিফেন্স সিস্টেম। আমার প্রথম ট্রেনিং এর অর্জনের সময় আমাদের উস্তাদ আমাদের জুডোর আওতাভুক্ত অনেকগুলো টেকনিক শিখায়, যেগুলো ছিল খুবই কার্যকরী এবং দ্বিতীয় ট্রেনিং এর সময় আমাদের উস্তাদ আমাদের কুংফু শিখায়, উনি ছিলেন কুংফুতে ব্ল্যাক বেল্ট অর্জনকারী। কিন্তু তিনি আমাদের কুংফু এতবেশী শিখান নাই, তিনি আমাদেরকে ডামি হাতিয়ার ব্যাবহারের উপর এবং অন্যান্য মিলিটারি ট্রেনিংগুলোর উপর ফোকাস করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের মার্শাল আর্ট রয়েছে, আমার কাছে সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসু মনে হয়েছে ওয়িং চুন এবং এটা শিখাটা খুবই হার্ড। তবে আপনাদের জন্য আমি যেটা নির্বাচন করেছি সেটা হচ্ছে তাইকুন্ডু, যেটার হার্ড হচ্ছে শুদু ফ্লেক্সিবিলিটি। আপনার পায়ের ফ্লেক্সিবল ঠিক হয়ে গেলে এটা শিখা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে, বাড়তি দিক হচ্ছে আপনি এটা একা একা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আমি এটা একা একাই শিখেছি, ভিডিও

দেখে। সেজন্য আমি আপনাদের জন্য সে ভিডিওগুলোর লিঙ্ক সিরিয়াল আকারে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ভিডিও গুলো ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে নিবেন। ভিডিওতে খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং কিছু কিক বক্সিং এর বক্সিং প্র্যাকটিসের ভিডিও দেয়া আছে নিম্নে।

• তাইকুণ্ডু বেসিক

১. https://www.youtube.com/watch?v=D০১r২৯wCzwI

২. https://www.youtube.com/watch?v=r১O২aMq০akU

৩. https://www.youtube.com/watch?v=X৭A৯৬CgJ৪GQ

৪. https://www.youtube.com/watch?v=ig১Oy-rzOS০

৫. https://www.youtube.com/watch?v=P৬PifDOklsg

৬. https://www.youtube.com/watch?v=-ntpFTRZRoI

৭. https://www.youtube.com/watch?v=D৮-TAJeR০eY

৮. https://www.youtube.com/watch?v=Um৬dkPLStf৮

৯. https://www.youtube.com/watch?v=nyOER৬U৭TgM

১০. https://www.youtube.com/watch?v=YANw১yTjDeY

১১. https://www.youtube.com/watch?v=NMICZNCv৪hE

১২. https://www.youtube.com/watch?v=৫০RAVxgTeCY

১৩. https://www.youtube.com/watch?v=oxcACgbbAlw

১৪. https://www.youtube.com/watch?v=১Hb-১Uyeh১Q

১৫. https://www.youtube.com/watch?v=jjyOrlAf৫lw

১৬. https://www.youtube.com/watch?v=Db০৯৮oKgzpk

১৭. https://www.youtube.com/watch?v=১vqL৬DDM৮ec

১৮. https://www.youtube.com/watch?v=৩SaKycgcKfI

১৯. https://www.youtube.com/watch?v=NMICZNCv৪hE

২০. https://www.youtube.com/watch?v=UYEVnH১WN০E

২১. https://www.youtube.com/watch?v=m৫DocuF১vHo

২২. https://www.youtube.com/watch?v=c১RBgLxPZuk

২৩. https://www.youtube.com/watch?v=WrVR২৬Dlvpo

২৪. https://www.youtube.com/watch?v=sMmh৬o৩oe০o

২৫. https://www.youtube.com/watch?v=oT_৮২a৫CbPA

২৬. https://www.youtube.com/watch?v=grGiweSyUuw

২৭. https://www.youtube.com/watch?v=ywT১knycLns

২৮. https://www.youtube.com/watch?v=D_O৪XhZu১bE

২৯. https://www.youtube.com/watch?v=HV৪UYZVUS৪s

৩০. https://www.youtube.com/watch?v=LZYtQk-৪xvE

• কিক বক্সিং বেসিক

১. https://www.youtube.com/watch?v=৭PGEGcTHHmg

২. https://www.youtube.com/watch?v=hWI৬ojJzBww

৩. https://www.youtube.com/watch?v=ToHtpegEhKI

৪. https://www.youtube.com/watch?v=gVixuVE০-ek

৫. https://www.youtube.com/watch?v=৬F_৬OExW৫-I

৬. https://www.youtube.com/watch?v=sbNhd০JLQXA

৭. https://www.youtube.com/watch?v=১-EVNlNZiks

৮. https://www.youtube.com/watch?v=dGcZzDnpyGQ

৪ – উইপন্সঃ এটা হচ্ছে পারমাণবিকের যুগ, আর আমাদের সামনের শত্রু বিশাল পারমাণবিক শক্তিধর, তো এখানে হাত আর লাঠি দিয়ে কিইবা হবে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অস্ত্রের ট্রেনিং করতে না পারলে আমরা অন্তত এগুলোর ভিতরে কি আছে এগুলো কিভাবে চলে এগুলোর ব্যাবহারের পজিশানগুলো অন্তত নিজের রুমে বসে দেখে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে পারব। আমরা পজিশান প্র্যাকটিসের জন্য বাজার থেকে বাচ্চাদের জন্য কিছু খেলনা পিস্তল পাওয়া যায় আপাতত সেগুলো কিনে ভিডিও দেখে পজিশান প্র্যাকটিস করতে পারি। আমি নিচে ভিডিও লিঙ্কগুলো দিয়ে দিলাম আপানারা ডাউনলোড করে নিবেন।

• উইপন্স রিভিও এবং Assembly Disassembly

¬ https://www.youtube.com/watch?v=tGrH৩৩uWCVk

¬ https://www.youtube.com/watch?v=ZyajvvsuGcU

¬ https://www.youtube.com/watch?v=৩yqbhjbb-৩g

¬ https://www.youtube.com/watch?v=EjQrhDKDWFk

¬ https://www.youtube.com/watch?v=BqZsSk৫FFX৪

¬ https://www.youtube.com/watch?v=_eQLFVpOYm৪

¬ https://www.youtube.com/watch?v=wAqE-KLbiYc

¬ https://www.youtube.com/watch?v=_q-s১yD৭৭৪w

¬ https://www.youtube.com/watch?v=umzYPNYjEiY

¬ https://www.youtube.com/watch?v=৫০sbFXjdalU

¬ https://www.youtube.com/watch?v=৯MGfM৯I_HDU

¬ https://www.youtube.com/watch?v=tHi১f৬IkMlA

• উইপন্স পজিশান

¬ https://www.youtube.com/watch?v=pR৩L০fcEzfk

¬ https://www.youtube.com/watch?v=owKowHKhpxQ

¬ https://www.youtube.com/watch?v=I০১I-LkU৩jA

¬ https://www.youtube.com/watch?v=e৪YpBdtUBaI

¬ https://www.youtube.com/watch?v=NsTU_mD_Z৭০

¬ https://www.youtube.com/watch?v=৬MFCyeOy১pQ

¬ https://www.youtube.com/watch?v=qzY৪_DPp১Ks

¬ https://www.youtube.com/watch?v=iwzo৫DadAjo

¬ https://www.youtube.com/watch?v=০Kb৯yY_GzbI

¬ https://www.youtube.com/watch?v=Q৭৬rZPrha১০

¬ https://www.youtube.com/watch?v=n_jfON১iJf০

¬ https://www.youtube.com/watch?v=FSvB৯-pjv৭৮

¬ https://www.youtube.com/watch?v=yaLFtK৩DP৫Q

¬ Full video

https://www.youtube.com/watch?v=e৪Yp...BBA০৯EBA০১৮C৩৮

¬ https://www.youtube.com/watch?v=cBb_eDYzTSA

¬ https://www.youtube.com/watch?v=NxyTFzgWjhk

¬ Full video

https://www.youtube.com/watch?v=Pk৮N...C১F৬E৭C২৩E৩০৫১

কেউ যদি লাইভ শুটিং করার প্র্যাকটিস করতে চান বা কেউ অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তাকে উস্তাদ শায়েখ আবু মু'সাআব আস-সুরীর থিয়োরি ফলো করা উচিত, সেটা হলঃ

"শুটিং প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে, এটা সম্পন্ন করতে হবে নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে এবং গুহার ভিতর উপযুক্ত অবস্থায়... এবং জনবিরল পাহাড়ি এলাকায়... বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে... মরুভূমিতে... ইত্যাদি, প্র্যাকটিসের সময় শক্তিশালী নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা নেয়া এবং প্র্যাকটিস এলাকা অনেক দূরত্ব রেখে সেখানে সতর্কতা পোস্টের ব্যবস্থা রাখা।"

(নোটঃ শায়েখ এখানে শুটিং এর শব্দজনিত নিরাপত্তা কথা তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় এটা কিভাবে করা যেতে পারে, প্রথমত এটা অবশ্যই করতে হবে জনবিরল এলাকায়। যদি সম্ভব হয় শুটিং প্র্যাকটিসের সময় গানের সাথে সাইলেন্সার ব্যাবহার করা। সাউন্ড সিস্টেম হচ্ছে এমন আপনি খেয়াল করবেন যখন দুই দিক থেকে দুই ধরনের শব্দ হতে থাকে যেটা তুলনা মূলক খুব কম শব্দ হয় সেটা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। তবে প্রযুক্তির এই যুগে কিছু সাউন্ড সিস্টেম মেশিন তৈরি হয়েছে, বড় শব্দের মাঝে যত সুক্ষ শব্দই থাকুক না কেন সেটা নির্ণয় করা যায়। যাইহোক, এই দেশের পরিবেশের ক্ষেত্রে আমরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি, কোন জনবিরল এলাকায় অবস্থিত রেললাইনের পাশে করা যেতে পারে যখন রেলগাড়ি আসাযাওয়া করে, তবে এলাকাটা অবশ্যই কিছুটা ঘন গাছ পালায় ঘেরা হতে হবে এবং সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে হচ্ছে এটা, বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল এলাকার দেশ, যখন মুষলধারে ঘন বৃষ্টিপাত হয় তখন আপনি শুটিং প্র্যাকটিস করতে পারেন তবে পূর্ণ সতর্কতা সাথে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৯৫

দ্য আর্ট অব জিহাদ (আর্ট অব ওয়ার অবলম্বনে)

১ম পর্বঃ যুদ্ধ পরিকল্পনা

Mujaheed of Hind

Senior Member

০৮-২২-২০১৯

যেকোন কাজের পূর্বে পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র বা সংগঠনের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আলাদা একটি বিভাগ থাকে যে বিভাগের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্র বা সংগঠনকে পরিকল্পনা দিয়ে সহায়তা করা। আর তা যদি হয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তাহলে তা আরো গুরুত্বপূর্ন। মূলত যুদ্ধ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এমন একটি বিভাগ নেই এরুপ কোন রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি কোন জিহাদী সংগঠন শুধুমাত্র নিজ দেশে স্থানীয়ভাবে কাজ করে তবুও স্থানীয় তাগুতের সাথে প্রয়োজনানুসারে কূটনৈতিক আলোচনায় যাওয়ার জন্য তাদের এমন একটি পরিকল্পনা বিভাগ থাকা উচিত যারা আলোচনার টেবিলে তাগুতের বিপরীতে শক্ত অবস্থানে থেকে চৌকস ডিপ্লোমেটদের ন্যায় কথা বলতে পারে, তর্কে-বিতর্কে উপনীত হতে পারে, উম্মাহর স্বার্থ উদ্ধারে বিভিন্ন শর্তারোপ করে তাগুতকে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি যুদ্ধ বা রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট কোন সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয় তাহলে যুদ্ধ পরিকল্পনায় সে একজন বিধ্বংসী পরিকল্পনাকারী বৈ আর কিছু না। তবে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত তিনটি পয়েন্টে আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি।

১. এমন কিছু লোক থাকে যারা যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন পন্থাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না বা করতে পারে না।

যেমনঃ

ক) সম্মুখ সমর এড়িয়ে কূটনৈতিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা অথবা

খ) যুদ্ধকে বিলম্বিত করে নিজেদের শক্তিমত্তা বাড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি।

এরকম লোকদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

ক) দৃঢ় নিয়াত রাখেন কিন্তু অতি উৎসাহী এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করেন।

খ) সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী কোন মুনাফিক বা তাগুত বা তাগুতের চর যে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য শত্রুকে আক্রমনের উস্কানী দেয়।

গ) ওয়ার স্ট্র্যাটেজিকে গুরুত্ব দেন না এমন কেউ, যে শত্রুর উস্কানী বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. কিছু কিছু সংকট সবসময়ই ডিপ্লোমেসি দিয়ে সমাধান করা উচিত।

যেমন – বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্থান তাদের ভূমিতে সংকট নিরসনে এবং নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে শান্তি আলোচনা জারি রেখেছে। ইমারাহ'র পক্ষ থেকে এখানে ডিপ্লোমেসি হচ্ছে আফগানের ভূমি হতে বহিরাগত সন্ত্রাসী সৈন্যদের বের করে দিয়ে সম্মুখ সমরে শত্রু সংখ্যা কমিয়ে নিয়ে নিজেদের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করা এবং পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে নেয়া। কিন্তু যদি ইমারাহ একগুয়ে অবস্থান গ্রহণ করতো এবং বলতো মার্কিনীদের সাথে কোন শান্তি আলোচনা নেই তাহলে চলমান সংকট নিরসনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকতো না। অথচ সিরাত থেকে আমরা জানি,

ক) সম্মুখ সমরে শত্রু সংখ্যা কমিয়ে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করা,

খ) কিছু পয়েন্টে সাহাবীগন (রদিয়াল্লাহু আনহুম) একমত হতে না পারলেও কাফিরদের সাথে সন্ধি করা,

গ) সামর্থ্য থাকার পরও সব সময় শত্রুর পিছনে না ছুটে কখনো কখনো যুদ্ধ বিরতি দিয়ে নিজেদের শক্তিমত্তা বাড়িয়ে নেয়া,

ঘ) ইসলামি রাষ্ট্র গঠন এবং তা সুবিন্যস্ত করার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করা ইত্যাদি ছিলো প্রিয় নাবী'র (সল্লাল্লাহু আ'লাইহিওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ বা কর্মপদ্ধতি।

৩. সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ ইসলামের চূড়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য স্পষ্ট আবশ্যকীয় বিধান।

ইসলামিক রাজনীতির পট পরিবর্তন করে দেয়ার ক্ষেত্রে জিহাদের আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এর বিধান এবং সীমারেখা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কিয়ামত পর্যন্ত যা বলবৎ থাকবে। এর মাধ্যমে যেমন আখিরাতের পাথেয় অর্জিত হবে তেমনি ইসলামিক রাজনীতির সুদৃঢ় অবস্থান ও উম্মাহর মর্যাদা রক্ষার উপায় সমূহ বিস্তৃতি লাভ করবে। তবে আমাদের মনে রাখা জরুরী, যেকোন যুদ্ধের পিছনে কূটনৈতিক ব্যর্থতা অন্যতম একটি কারণ। অর্থাৎ যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে কূটনৈতিকভাবে কোন ফলাফল না আসা। আমরা সিরাত থেকে পাই যে, কোন বিশেষ অপরাধী সম্প্রদায় ছাড়া সাধারণ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই যুদ্ধ পরিচালনা করতেন না। বরং প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হতো। আর এটা তারা প্রত্যাখ্যান করলে জিজিয়া'র শর্তারোপ করা হতো। যদি জিজিয়ার শর্তও প্রত্যাখ্যান করতো তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হতো। জিহাদ পরিচলানার আগে কোন সাধারণ কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলামের দাওয়াতকে একধরণের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে যেখানে আলোচনার মাধ্যমে প্রথমে ইসলাম গ্রহনের এবং পরে জিজিয়া প্রদানের শর্ত প্রদান করা হয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত নেই তখন এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানোর প্রেক্ষাপট হয়তো ভিন্ন রকম হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন মুসলিমদের তামক্কীন অর্জন করা একটি মুখ্য বিষয় তখন কোন বৈধ উপায়ে যুদ্ধকে বিলম্বিত করা নিসন্দেহে অনেক বড় ধরনের কূটনৈতিক সফলতা।

প্রাইমারি ক্যালকুলেশন বা এস্টিমেশন বা লেইং প্ল্যানঃ

১. যুদ্ধ একটি রাষ্ট্র বা সংগঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দু'টি দিক – জীবন অথবা মৃত্যু; ধ্বংস অথবা টিকে যাওয়া। আর প্রত্যেকটি যুদ্ধ নির্ধারিত কিছু

ক্ষতি বয়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধের জন্য প্রথমেই আবশ্যক হচ্ছে একটি সেনাবাহিনী থাকা। এক্ষেত্রে –

ক) সেনাবাহিনী গঠনে কিছু নির্ধারিত সময় ব্যয় হবে।

খ) সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ করে তুলতে হবে। যেমন কোন গেরিলা যোদ্ধা গেরিলা যুদ্ধের উপর তাত্ত্বিকভাবে পারদর্শীতা রাখবেন এটাই যুক্তিযুক্ত। আর যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শীতা না থাকলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ফায়দা হাসিলের পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সময়ের দাবি মাত্র।

গ) সেনাবাহিনী'র যাবতীয় খরচ বহনের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

ঘ) এলাকা ও শত্রুভেদে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র থাকতে হবে।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে যা ভালোভাবে পর্যালোচনা করে নিতে হবেঃ

ক) সঠিক প্রতিপক্ষ নির্বাচন। যেমন – হিন্দে প্রতিপক্ষ নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাবে ভারত। আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে কম অগ্রবর্তী রাষ্ট্র যেমন শ্রীলঙ্কা এবং স্থানীয় শত্রু বাহিনী প্রাথমিক পর্যায়ে এড়িয়ে চলা। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য "জিহাদের সাধারণ দিক নির্দেশনা" এবং "উপমহাদেশীয় মুজাহিদীনদের আচরণবিধি" শীর্ষক নির্দেশিকা দু'টি দ্রষ্টব্য।

খ) সঠিক সময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। এটা হতে পারে ঋতু ভিত্তিক অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের শক্তিমত্তার পরিধি ভিত্তিক অথবা যে অঞ্চলে যুদ্ধে জড়ানো হবে সে অঞ্চলের জনমত আমাদের পক্ষে সহায়ক হবে কি না তার উপর ভিত্তি করে। এগুলো মূলত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের সঠিকতা নির্ধারক।

গ) উপযুক্ত ময়দানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। যেমন- আমরা কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে পার্বত্য অঞ্চলে অথবা কোন বনাঞ্চলে যুদ্ধে জড়াতে পারি না যেখানে কি না এরুপ অঞ্চলে কিভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হয় তার উপর আমাদের কোন প্রশিক্ষণ নেই। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য নিজের সুবিধানুযায়ী ময়দান নির্ধারণ করা নিতান্তই জরুরী। এর জন্য প্রয়োজনে শত্রুপক্ষকে কোন ময়দানে টেনে আনার দরকার হতে পারে যেমনটি ৯/১১ এর বরকতময় হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্থানের কঠিন ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিলো।

২. পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য কতটা অনুকুল তা পাঁচটি মৌলিক ফ্যাক্টরের আলোকে যাচাই করতে হবে।

প্রথম ফ্যাক্টরঃ "মোরাল ইনফ্লুয়েন্স" বা নৈতিক প্রভাব। আমরা জানি কুফ্ফার বাহিনী এবং তাদের গোলাম স্থানীয় তাগুত বাহিনীগুলোতে নৈতিক প্রভাবের কোন বালাই নেই। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনীতে নৈতিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়। নেতৃত্ব যদি নৈতিক প্রভাব আর উপযুক্ত কারণ নিশ্চিত করতে পারে তাহলে প্রতিটি সৈনিক এমনকি মুসলিম জনতাও ভয়ের বিপরীতে শেষ নিশ্বাঃস পর্যন্ত লড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধে "Righteousness of Cause" বা সন্তোষজনক কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানে কেন যুদ্ধ করা হবে তার কোন সন্তোষজনক কারণ থাকতে হবে। ৭১'এ পাক বাহিনী এই ব্রিফিং পেয়ে বাঙ্গালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, "পূর্ব পাকিস্থানে সব বিধর্মী বেঈমানদের বাস"। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সৈন্যরা বুঝতে পারলো বিধর্মীদের নয় বরং মুসলিমদেরকেই তারা হত্যা করছে। যা সৈন্যদেরকে দ্বিধান্বিত করে তোলে এবং নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন সামনে চলে আসে। ফলে, পাকিস্থান সেনাবাহিনী যথেষ্ট প্রশিক্ষিত ও উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খুব দ্রুত তাদের সৈনিকসুলভতা হারালো এবং পরাজিত হলো। কারণ একটাই তা হলো, এ যুদ্ধে তারা কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পায়নি।

ঠিক একইভাবে ২০১৪ সালে উম্মাহ'র বিষ ফোঁড়া আইএস যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন অনেকেই আবেগের বশে তাদের হয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ভাই আইএস থেকে পালিয়ে আসেন শুধু এই কারণে যে, আইএসের জিহাদের পিছনে তারা কোন সন্তোষজনক কারন খুঁজে পায়নি এবং তারা নেতৃত্বের পর্যায় থেকে এমন অনেক মিথ্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। একই সাথে তারা এটাও প্রত্যক্ষ করেছে যে আইএস অধিকাংশ সময় কালিমার পতাকা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করছে এমন মুজাহিদদেরসহ সাধারণ মুসলিমদেরই রক্ত ঝড়িয়েছে শুধুমাত্র তাদের আনুগত্য মেনে না নেয়ার কারণে।

অথচ উহুদ বদরের দিকে আপনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন। নৈতিকতার প্রভাব এবং সন্তোষজনক কারণ কি জিনিস তা স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। ১২০০ সৈন্যের

বিপরীতে ৩১৩ এর বিজয়, দুই লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে ৪০ হাজারের বিজয়, সভ্যতা থেকে পিছিয়ে থাকা একটি মাত্র রাষ্ট্রের বিপরীতে ৪৮ টি তাগুত রাষ্ট্রের সম্মিলিত আক্রমণ অতঃপর ১৭ বছর পরে এসে শান্তি আলোচনার জন্য মুসলিমদের হাতে-পায়ে ধরা। এছাড়াও প্রত্যেকটি জিহাদে খলীফা আর সেনাপতিদের নৈতিক প্রভাবের অসংখ্য উদাহরণ আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা হবে এর চেয়ে বড় নৈতিকতাবোধ এর চেয়ে বড় সন্তোষজনক কারণ আর কিছু থাকতে পারে না। আর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আল্লাহ'র ইচ্ছায় ধাপে ধাপে এগুতে থাকে। যেখানে নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধের বিষয় আছে, কিসাসের বিধান আছে। এটা আল্লাহ'র বিধান যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের এবং যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।

জনগনের পক্ষ থেকে যদি "নাহি আনিল মুনকার" তথা "অন্যায় কাজে বাধা" প্রদানের বিষয়টিকে শক্তিশালী করা হয় তাহলে একটি ইসলামি আন্দোলন তথা জিহাদী কার্যক্রম নিজের থেকেই গতিশীল হয়ে ওঠে। আর আজ অথবা কাল জনগন এটা করতে বাধ্য। কারণ, যে অন্যায় জনগনের সাথেই করা হয় তার বিরুদ্ধে একসময় জনগনই কঠোর অবস্থান গ্রহন করবে। বিষয়টি এইভাবে ভেবে দেখা যায়, বিগত ১০০ দিনে বাংলাদেশে প্রায় ৩৫০ টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। এটা যেমন সত্যি কথা যে ধর্ষিতারা আমাদেরই কারো মা কারো বোন ঠিক একইভাবে একথাও সত্যি যে, তাগুত সরকার ধর্ষন প্রতিরোধে অথবা ধর্ষককে শাস্তি প্রদানে জনগনকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তাই এখানে নির্যাতিতদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামনে চলে আসবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এমন অনেক জুলুমের নজির আছে যেগুলোতে এদেশের জনগন বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায় নির্যাতিত। তাই এসব জুলুমের বিরুদ্ধে জনগনই তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে খুবই উৎকৃষ্ট একটি সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাবে ইনশাআল্লাহ।

কেন সুবর্ণচরের ভাইয়েরা জেগে ওঠে না? কেন নোয়াখালীর ভাইয়েরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে না? কেন নুসরাত, তণুদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে অপরাধীদের লাশ ফেলা হয় না? – এসব প্রশ্নের উত্তর খুব অচিরেই বাস্তবতায় রুপ নেবে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে? সুবর্ণচরে কিছু ভাই জেগে উঠবে, তারা একত্রিত হবে,

অতঃপর রাতের অন্ধকারে এই অপরাধীদের শাস্তি দেয়া শুরু করবে। একইভাবে নোয়াখালীতে এবং এভাবে পুরো দেশেই। কারণ, এমন অপরাধীদের মারার জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বুকে হিম্মত কম থাকলে এদেরকে জবাই করেও মারার দরকার নেই। মজবুত লাঠি দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করো, অতঃপর কোথাও লাশ ঝুলিয়ে দাও। একটা চিরকুট রেখে দাও "উমুককে ধর্ষনের শাস্তি", "উমুককে হত্যার শাস্তি" ইত্যাদি। কারণ, অপরাধীদের অপরাধই তাকে শাস্তি দেয়ার সন্তোষজনক কারণ। ঠিক এমনিভাবে তাগুত-মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের পিছনেও বাংলার মুসলিমরা একটি সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পেতে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বাস্তবিক অর্থে কুফ্ফার তাগুত-মুর্তাদদের কোন কাজ বিশেষত কোন তথ্য সন্ত্রাস বা কোন যুদ্ধ যা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচলিত হয় সেগুলোতে কখনোই সন্তোষজনক কারণ থাকে না। কিন্তু তাদের আছে হলুদ মিডিয়া। যারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তাদের প্রভূদের এসব মানবতাবিরোধী, নিয়ম বহির্ভূত কাজের সাফাই গাইতে থাকে, জনগনের সামনে বানোয়াট সন্তোষজনক কারণ উপস্থাপন করে তা প্রচার করতে থাকে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, প্রাথমিকভাবে জনগন তাদের মিথ্যা প্রচারণায় প্রতারিত হলেও কিছু দিনের মধ্যেই সত্য তাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেমন – জুলুমবাজ এ্যামেরিকার তথাকথিত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"র স্বরুপ আজ সবার কাছে পরিস্কার। একইভাবে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ জঙ্গীবাদ বলে যে আওয়াজ তোলা হয়েছিলো তার স্বরুপ হুজুগে বাঙ্গালীদের কাছেও আজ পরিস্কার। জঙ্গীবাদ শব্দ ব্যবহার করে মালাউনদের আজ্ঞাবাহী গোলাম তাগুত আওয়ামী সরকার কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, কিভাবে ২০০৯ সালে বায়তুল মুকাররমের ভিতর ৯ জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করেছে, কিভাবে শাপলা চত্বরের ট্র্যাজেডি সংগঠিত করেছে তা বাংলার ইসলাম প্রিয় জনগন আজ বুঝে গেছে। "অরাজকতার ব্যবস্থাপনা" অনুযায়ী এটাই হচ্ছে কোন জুলুমবাজ রাষ্ট্রের সেই নাজুক সময় যখন তাদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডার স্বরুপ প্রকাশিত হয়ে যায় এবং এরফলে জনগন জুলুমের বিপরীতে দাঁড়াতে একটি সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় ফ্যাক্টরঃ আবহাওয়া। একবার সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী একটি বিশেষ অভিযানের জন্য তার সেনা বাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন যেখানে তার বাহিনীকে শত্রুদের সাথে কনকনে শীতে পাহাড়ি অঞ্চলে লড়াই করতে হয়েছে। তো এই অভিযানে যাওয়ার আগে তিনি তার সেনাবাহিনীকে কয়েক মাস ধরে কনকনে শীতের রাতে পাহাড়ী অঞ্চলে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ'র ইচ্ছায় মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রুর ভূমিতে গিয়ে এই রকম বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ বিশ্লেষকদের মতে, যদি সুলতানের সেনাবাহিনী এই রকম কঠিন প্রশিক্ষণ না নিতো তাহলে শুধুমাত্র বৈরি আবহাওয়ার কাছেই তারা পরাজিত হতে বাধ্য ছিলো।

তাই আপনার সেনাবাহিনী যেখানে যুদ্ধ করবে সেই ময়দান সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আপনাকে ভালোভাবে জেনে-বুঝে এগুতে হবে,

ক) সেখানকার আবহাওয়ার সাথে আপনার বাহিনী কত দ্রুত খাপ খাওয়াতে পারবে?

খ) আবহাওয়ার পারিপার্শ্বিকতার সাথে যুদ্ধ করে কতদিন টিকে থাকতে পারবে?

গ) কতদিন আপনি আপনার বাহিনীর জন্য রসদ যুগিয়ে যেতে পারবেন?

যেমন প্রথমে নেপলিয়ন পরে হিটলার রাশিয়া আক্রমন করে হেরেছে। আদতে তারা হেরেছে রাশিয়ান ঠান্ডার কাছে। রাশিয়ার মাটিতে রাশিয়াকে হারানোর মতো ট্রেনিং ও লজেস্টিক সাপোর্ট কোনটাই না থাকার কারণে হিটলারের অপারেশন বার্বারাসো হয়ে গেছে ইতিহাসের অন্যতম ভূল আর মর্মান্তিক সামরিক অভিযান।

এমনিভাবে আমাদের ভূমিতেও আবহাওয়া কেন্দ্রিক বৈরিতা আছে। কিন্তু একটি সাহায্যকারী ভূমি হিসেবে আমরা কখনোই আমাদের শত্রুকে এদেশে টেনে আনবো না। বরং শত্রু ভূমিতে গিয়েই আমাদেরকে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে। তাই, আমাদেরকে জানতে হবে শত্রুদেশের ঋতু বৈচিত্র্য এবং অঞ্চলভেদে সেদেশের বৈরি আবহাওয়া সম্পর্কে।

তৃতীয় ফ্যাক্টরঃ টেরেইন আরেকটি বিশাল ফ্যাক্টর। ইংরেজী Terrain শব্দের প্রাসঙ্গিক মানে হলো একটি যুদ্ধক্ষেত্র সংলগ্ন গাছপালা, পাহাড়-উপত্যকা, নদ-নদী, রাস্তাঘাট, বসতি ইত্যাদি। তাই আপনি যে অঞ্চলে লড়বেন সে অঞ্চলের

টেরেইন সম্পর্কে আপনার বাহিনীর খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে। এক কথায় বললে বিষয়টি এরকম হয় যে, ময়দানের টেরেইন সম্পর্কে আপনাকে ঠিক সেই রকম অবগত থাকতে হবে যেমনটি আপনি নিজের এলাকা সম্পর্কে অবগত। টেরেইনের উপর নির্ভর করে আপনার ক্যাপাসিটি যাচাই করতে হবে। যদি এমন হয় যে দু'টি নদী পেরিয়ে আপনাকে আক্রমন পরিচলনা করতে হবে তাহলে হিসেব কষে দেখতে হবে সামরিক ব্রীজ বানিয়েঃ

ক) মেইন স্পটে আপনার ফোর্স কন্সেন্ট্রেট করার এবং

খ) বিশেষ সময়ে আপনার ফোর্স রেসিও শত্রুর চেয়ে বেটার রাখার ক্যাপাসিটি আপনার আছে কি না।

এক্ষেত্রে টেরেইনের উপর ভিত্তি করে যে বিষয়গুলো পূর্বেই নির্ধারন করে নিতে হবে তা হচ্ছেঃ

ক) প্রয়োজনীয় সময়ে ফোর্স কন্সেন্ট্রেশন এচিভ করা।

খ) কোন পথে কোথা থেকে ফোর্স আনা হবে তা নির্ধারন করা।

গ) কোথায় বিশ্রাম নেবেন তা নির্ধারন করা।

ঘ) কোথায় শত্রুকে ক্যানালাইজ করবেন তা নিশ্চিত করা।

ঙ) প্রয়োজন হলে কোন পথে পিছু হটবেন তা নির্ধারন করা।

এখন ইদাদের ক্ষেত্রে এই টেরেইনের প্রয়োগ আমরা কিভাবে করতে পারি তা আমাদেরকে জানতে হবে। এটা সাধারণ একটা মিটের ক্ষেত্রে বা আসলিহাত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। কিভাবে –

ক) প্রথমে আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে টেরেইনের উপর স্টাডি করতে হয়।

খ) কিভাবে গুগল ম্যাপ ইউজ করে ঘড়ে বসে আমরা টেরেইন স্টাডি করতে পারি।

গ) কিভাবে জিআইএস (জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম) স্টাডি প্রয়োগ করে টেরেইন স্কেচ তৈরি করতে পারি।

ঘ) সাক্ষাতের আগেই সাক্ষাতের স্থান পরিদর্শন করে টেরেইন অনুযায়ী পরিকল্পনা করে প্রাকটিস করতে পারি। যেমন – কোন পথে সাক্ষাতে যাবো, কোন পথে ফিরে আসবো, সমস্যা হলে কোন অলি-গলি পথ ব্যবহার করে সেফ জোনে চলে যাবো ইত্যাদি।

চতুর্থ ফ্যাক্টরঃ সেনাপতিদের কোয়ালিটি। মুসলিম বাহিনীগুলোর মধ্যে সবসময় কুফফার তাগুত বাহিনীগুলোর চেয়ে একটি গুণ অতিরিক্ত থাকা আবশ্যক। তা হচ্ছে, পরহেযগারিতা। তবে এর সাথে প্রাসঙ্গিক গুণাবলীরও চমৎকার সমন্বয় থাকা জরুরী। এক দৃষ্টিতে গুণাবলীগুলো এমন যা একজন কমান্ডার বা সেনাপতির মধ্যে থাকতে হবে বা থাকেঃ

পরহেযগারিতা। চিন্তা করে দেখুন, নববী যুগ সাহাবীদের যুগের কথা। একজন কমান্ডার সারাদিন ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন আর সারারাত তাহাজ্জুদে মশগুল থেকেছেন। সিয়ামরত অবস্থায় সারাদিন জিহাদ করেছেন, রাতে তাহাজ্জুদে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁদের পর্যায়ে কখনোই যেতে পারবো না এটা সত্য, কিন্তু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে উচু মানের আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা, অল্প খাওয়া অল্প বিশ্রামে কঠিন কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত হতে পারা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কমান্ডো ইউনিটের এক এক জন কমান্ডার টানা ৩/৪ দিন পানি ও খাবার না খেয়ে এবং স্বল্প বিশ্রামে টিকে থাকতে পারতেন।

বিচক্ষণতা। একজন বিচক্ষণ কমান্ডার পরিবর্তিত পরিস্থিতি দ্রুত অনুধাবন করে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দৃঢ়তা। উহুদের ময়দানের কথা ভেবে দেখুন। যখন মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হলো মুসলিমদের সেনাপতি প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহিওয়াসাল্লাম) শহীদ হয়ে গেছেন তখন মুসলিম বাহিনী দিগ্বিদিক ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো তাদের সুবিন্যস্ত বাহিনী, ভেঙ্গে গেলো তাদের শৃঙ্খল। অতঃপর রসুলের এক আহ্বানে মুসলিম সেনারা একত্রিত হলেন ফলশ্রুতিতে শত্রু বাহিনী বিজয়ীবেশে মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার পরিবর্তে ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো।

দুর্দান্ত সাহসিকতা যা শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। চিন্তা করে দেখুন আমাদের বোন খাওলা বেগোভিচের কথা। সার্ভিয়ান সাদা চামড়ার কুকুরদের বিরুদ্ধে যিনি একজন নারী হয়েও উম্মাহ'র তরে অস্ত্র তুলে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। যখনই কোন ময়দানে এই বোনের উপস্থিতির কথা প্রচার করা হতো তখনই সাদা চামড়ার এই কুকুরগুলো ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতো। চিন্তা করুন ভাই সাজ্জাদ আফগানির কথা। ময়দানে সাজ্জাদ আফগানির নাম উচ্চারিত হওয়া মানেই শত্রুদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মহড়া শুরু হয়ে যেতো।

তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মুসলিম সেনাপতিদের নামে ও উপস্থিতিতে ময়দান অতীতে প্রভাবিত হয়েছে বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ। আর আমাদেরকে এমনই সেনাপতি তৈরি করতে হবে, এমনভাবেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম ফ্যাক্টরঃ ডক্ট্রিন। ইংরেজী ডক্ট্রিন শব্দ বলতে বুঝায় ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রশিক্ষণ বা নির্দেশনার একটি সমন্বিত রুপ। যে সেনাবাহিনীর ইউনিটি, র*্যাঙ্ক স্ট্রাকচার, চেইন অব কমান্ড আর লজিস্টিক সিস্টেম যত উন্নত সে বাহনীর জয়ের সম্ভাবন তত বেশি। যা শ্রবন ও আনুগত্যের এক বিস্তৃত রুপরেখা। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মুসলিম বাহিনীর বিজয় সৈন্য সংখ্যা বা অস্ত্রবলে আসে না বরং তা আসে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের পুরস্কার স্বরুপ। তাই পার্থিব আসবাব সাধ্যানুযায়ী গ্রহণ করে আল্লাহ'র উপর তাওয়াক্কুল করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখা জরুরী। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্ষণিক পিছু হটা ময়দান থেকে পলায়নের নামান্তর নয়। তোরাবোরা পাহাড় থেকে পিছু হটা আলকায়দার কর্মীবৃন্দ পরিবর্তীতে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে কুফ্ফার জোটের সম্মিলিত আক্রমণে ইসলামিক ইমারাতের কর্মীরা তাদের রাজধানী ছেড়ে পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর আল্লাহ'র ইচ্ছায় সেই পিছু হটার মাধ্যমে পুনরায় ট্র্যাকে ফিরে আসা বর্তমান মুজাহিদদের দৃঢ় অবস্থান ও শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অর্জন আমাদের সামনে এক জ্বলজ্যান্ত পরিসংখ্যান হয়ে আছে।

নোটঃ আমাদের দেশের জিহাদ সমর্থক ভাইদের উচিত নিজ নিজ এলাকার উপর গভীর স্টাডি করা। যেমন – ঢাকা এর ভাই ঢাকাসহ দেশের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ

এলাকার উপর, চট্টগ্রামের ভাই চট্টগ্রামসহ দেশের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর এভাবে প্রত্যেক এলাকার ভাইয়েরা নিজ এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর স্টাডি জারি রাখতে পারেন ইনশাআল্লাহ। নিজ নিজ এলাকার আবহাওয়া বৈচিত্র্য কেমন? ঋতুভেদে কি ধরনের বৈরিতা দেখা যায়? কিভাবে সেই সব বৈরিতার বিরুদ্ধে সহজে টিকে থাকা যায়? ইত্যাদি। পাশাপাশি রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা, বিশেষ বিশেষ জায়গা চেনা, বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানা ইত্যাদি। একইভাবে যথাসম্ভব আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উপর উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করা বিশেষ করে ভারত ও মায়ানমারের উপর। যেন আমরা এদেরকে এদেরই ভূমিতে, এদেরই পাহাড়ে, এদেরই জঙ্গলে এদেরই সমুদ্রে কবর দিতে পারি বিইযনিল্লাহ।

চলবে ইনশাআল্লাহ.....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৯৪

দ্য আর্ট অব জিহাদ (আর্ট অব ওয়ার অবলম্বনে)

২য় পর্বঃ যুদ্ধ পরিকল্পনা

Mujaheed of Hind

Senior Member

০৮-২৩-২০১৯

শত্রুকে ধোঁকা দেয়া

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহিওয়াসাল্লাম) বলে গেছেন, "যুদ্ধ মানে ধোঁকা" (বুখারী)

আর বর্তমান আধুনিক বিশ্বে সবাই এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, "All war based on deception".

যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে পারা বা প্রতারিত করতে পারা মানেই হচ্ছে সাময়িকভাবে আপনি শত্রুপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর যদি শত্রুপক্ষের মাঝে এই সাময়িক বিজয়ের প্রভাবকে বিস্তৃত করা যায় তাহলে এটা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া ও শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য কার্যকরী হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রাথমিকভাবে আমরা আলোচনা করবো "পজিশনাল এডভান্টেজ" তথা "অবস্থানগত সুবিধা" সম্পর্কে। বিষয়টা আমরা ওয়ার স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে বুঝার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

১. "জিহাদের সাধারণ দিক নির্দেশনা" ও "উপমহাদেশীয় মুজাহিদীনদের আচরণবিধি" অনুযায়ী আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখার বহুল পরিচিত ও অন্যতম যুদ্ধ কৌশল হচ্ছে উপমহাদেশীয় কুফরের মাথা ভারতকে প্রধান টার্গেট হিসেবে বাছাই করা। আর আমরা জানি যে, উপমহাদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং

ইসলামের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু হচ্ছে ভারত। এই অবস্থান থেকে বাংলাদেশের আপামর জনগন এটা জানে যে, ভারত কখনোই বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র ছিলো না, এখনো নেই আর ভবিষ্যতেও হবে না। এর অনেক অনেক নজির আমাদের কাছে মজুদ আছে। তাই শত্রু নির্ধারণে আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখার এই অবস্থান এদেশের আপামর জনসাধারণের পক্ষের অবস্থান। অপরদিকে ভারত ইস্যুতে এ দেশের তাগুত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান খুবই নাজুক। কারণ, জনগণের উপর জুলুম চাপিয়ে মালাউনদের তাবেদারী করার মাধ্যমে এ তাগুত সরকার জনগনের মাঝে যে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের জন্ম দিয়ে চলেছে এর ফলে জনসমর্থনের দিক থেকে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রয়োগকৃত আল-কায়দার বৈশ্বিক যুদ্ধ কৌশল অনেক শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. কোন সারিয়া (ছোট অভিযান) পরিচালনার জন্য আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখার মুজাহিদ ভাইয়েরা প্রথমেই যেসব টার্গেটকে নির্ধারণ করেছিলো তারা প্রত্যেকে ছিলো শাতীম তথা আল্লাহ, আল্লাহ'র দ্বীন, আল্লাহর কিতাব, রসুল (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) এবং সম্মানিত উম্মুল মুমিনীনদের (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিয়ে কটুক্তিকারী নাস্তিকরা। এদের মানসিকতা, কটুক্তি এতোটাই নিকৃষ্ট ও নিচুমানের ছিলো যে একজন পাপী মুসলিমও ক্রোধে প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠতো। চিন্তা করে দেখুন, শুধু এই নাস্তিকদের ইস্যুকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালের ৫ই মে নবী প্রেমিক লাখ লাখ মুসলিমের পদচারণায় ঢাকা অচল হয়ে পড়েছিলো। তাই, টার্গেট নির্ধারনেও আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখা দক্ষতার যে প্রমান রেখেছে তা নিতান্তই প্রশংসার দাবিদার। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টার্গেট নির্ধারণে তাদের এ দক্ষতার সুফল প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এমন কোন নাস্তিক খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা প্রকাশ্যে দম্ভভরে ইসলাম সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে কটুক্তি করার সাহস রাখে। হাতে গোনা যে ২/৩ জনকে পাওয়া যায় তারাও কোন না কোন পশ্চিমা রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাদের বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে আশা রাখা যায়, নিকট ভবিষ্যতে আসিফ মহিউদ্দীনদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য এদেশের মুজাহিদ ভাইদেরকে জার্মানীতেও আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।

৩. সুযোগ থাকলেও মাফসাদা ও জনসমর্থনের দিক বিবেচনা করে আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখার মুজাহিদ ভাইয়েরা দেশীয় তাগুত বাহিনীগুলোর সাথে সংঘাত

এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে দূর্নীতি ও অন্যায়ের সবচেয়ে উঁচু স্তরে থাকা পুলিশ বাহিনীর সাথে। এর প্রধানতম কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়

ক) স্থানীয় শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে মূল শত্রু থেকে যেন পিছিয়ে না পড়তে হয় এবং মূল শত্রুকে আঘাত করার আগেই স্থানীয় শত্রুর মোকাবিলায় নিজেদের শক্তি কমে না যায়।

খ) বাংলাদেশের জনগণকে তাগুত বাহিনীগুলোর অসংখ্য অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেয়া যেন জনগণের কাছে এদের স্বরুপ পূর্ণরুপে প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, ইতিমধ্যে সাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী জনগণও তাগুত বাহিনীগুলোর বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছে।

খ) তাগুত বাহিনীগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু লোক এমন আছে যারা ধর্মপ্রাণ এবং খাঁটি দেশ প্রেমিক। তারা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিক বিবেচনা করে তাদেরকেও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ রাখা এবং তারা যেন হক্কের প্রতি অগ্রগামী হয়ে তার ক্ষেত্র তৈরি করা।

৪. পার্শ্ব শত্রু যেমন – বিজাতীয় বিভিন্ন আগ্রাসী সংগঠন, পশ্চিমা অর্থায়নে পরিচালিত ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন এনজিও/ সংস্থা ইত্যাদি পার্শ্ব শত্রুদের ব্যাপারেও আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখা এড়িয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে। কৌশল বিবেচনায় যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর একটি প্রধান কারণ হলো, স্থানীয় শত্রু না বাড়িয়ে মূল শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে থাকা এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করতে থাকা।

৫. আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল-কায়দা বাংলাদেশ শাখা বরাবরই সাধারণ জনগনের নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে টার্গেট নির্ধারণ করে থাকে যেন জনগন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মুসলিম জনসাধারণ জিহাদ বিষয়ে সংশয়ে পতিত না হয়। পাশাপাশি এমন উস্কানি প্রদান করা থেকেও বিরত থাকে যার কারণে বাংলাদেশে অবস্থানরত নিরীহ সংখ্যালঘুরা জুলুমের শিকার হতে পারে। তবে সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকেও যদি কেউ ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তার বিদ্বেষের মাত্রানুযায়ী মুজাহিদ ভাইয়েরা সঠিক পন্থাই অবলম্বন করবেন ইনশাআল্লাহ।

এবার আসুন ময়দানে উক্ত হাদীসের উপর আমল সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ জানা যাক –

১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধে যখন এক কুরাইশ বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সে ধোঁকায় ফেলা যায় এবং তার থেকে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে চাচ্ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে লড়তে কতজন শত্রু জড়ো হয়েছে। প্রশ্নটি সরাসরি না করে (কারণ এতে লোকটি সাথীদের সাহায্যার্থে মিথ্যে বলতে পারে) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তারা কতগুলো উট জবেহ করেছে। লোকটি বলল প্রতিদিন ১০টা করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন হিসাব করলেন এক একটা উট ১০০ জনের মত খেতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেল সেদিন কুরাইশদের নেতৃত্বে ১০০০ লোক ছিল।

২. অপর এক যুদ্ধে মুসলিম শিবিরে প্রতি রাতে একটি করে রান্নার চুলা কমিয়ে দেয়া হচ্ছিলো ফলে শত্রুরা মনে করেছিলো যে, মুসলিম শিবির থেকে প্রতিদিন যোদ্ধারা চলে যাচ্ছে। অথচ মুসলিম শিবিরে সৈন্য সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিলো। এর ফলে শত্রুপক্ষ চরমভাবে ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলো।

৩. শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়া এবং অবস্থানগত সুবিধার নমুনা হিসেবে ইয়ারমুকের যুদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাইজান্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহুআনহু ইয়ারমুক প্রান্তরে পশ্চিম দিকে মুখ করে পজিশন নিয়েছিলেন। এর ফলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিপক্ষ বাইজান্টাইনদের চোখে সূর্য পড়তো, ফলে দূর থেকে তারা মুসলিম সেনাদের সঠিক সংখ্যা বুঝতে পারতো না। উপরন্তু খলিফা উমার রদিয়াল্লাহুআনহু নির্দেশ দিলেন যেন প্রতিদিন সকালে মুসলিম সেনারা ছোট ছোট দলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে খালিদের বাহিনীতে যুক্ত হয়। ফলে বাইজান্টাইনরা ভাবতে লাগলো, প্রতিদিনই মুসলিম শিবিরে না জানি কতশত নতুন সেনা যোগ দিচ্ছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও এর প্রভাব ছিলো অনেক বড়। কারণ বিপক্ষ শিবিরে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধির ভাবনাটি বাইজান্টাইনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিলো।

গুরুত্বপূর্ণ নোটঃ

ক) "যুদ্ধ মানেই ধোঁকা" হাদীসের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমল করতে হবে। সেটা হোক ময়দানে অথবা ইদাদরত অবস্থায়।

খ) উত্তমভাবে নিজেদের জন্য অবস্থানগত সুবিধা নিতে হবে। সেটা হোক ময়দানে অথবা যুদ্ধ কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বা নিজেদের পক্ষে জনমত তৈরি করার ক্ষেত্রে।

গ) মাঝে মাঝে নিজেদের সক্ষমতা গোপন রাখতে হবে যেন শত্রুপক্ষ মনে করে মুজাহিদরা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঘ) মাঝে মাঝে এমন কিছু করতে হবে যেন শত্রুপক্ষ তটস্থ হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম লোন উলফ হামলার নির্দেশিকার কথা। আলহামদুলিল্লাহ, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশে অথচ ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা "র" এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা "সিআইএ" পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেছিলো। এ ম্যাগাজিনের উপর উপর্যুপরি গবেষণা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রিয়ভাবে এদেশে অবস্থিত তাদের লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

ঙ) শত্রুর বিশেষ সামর্থ্যকে চিহ্নিত করতে হবে, স্ট্রেন্থ তথা শক্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং দুর্বল জায়গার উপর আঘাত করতে হবে।

চ) শত্রুপক্ষকে তখনই উস্কে দেয়া ঠিক হবে যখন তাদেরকে তছনছ করে দেয়ার মতো সামর্থ্য থাকবে।

ছ) শত্রুর উস্কানি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাংলাদেশ তাগুত সরকার পদে পদে আল-কায়দার মুজাহিদ ভাইদেরকে উস্কে দিয়ে মাঠে নামানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা তাগুতের এ উস্কানি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

জ) শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্য প্রলুব্ধ করতে হবে, যেন সহজেই তাদেরকে ঘায়েল করা যায় এবং নিজের শক্তির খুব সামান্যই ক্ষয় হয়।

ঝ) আঘাত হানার জন্য উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বেশি বেশি হিসেব কষতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যুদ্ধ কৌশল, কর্মপদ্ধতিতে উপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে।

ঞ) শত্রু প্রস্তুত হওয়ার আগেই আঘাত করতে হবে এবং এমন দিক থেকে আঘাত করতে হবে যেদিক দিয়ে শত্রু কস্মিনকালেও আক্রান্ত হবে বলে ভাবেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশে যখন আল-কায়দার মুজাহিদ ভাইয়েরা একের পর এক শাতিমদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিলো ঠিক ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে তারা টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেটি ছিলো সমকামী সংগঠক জুলহাস মান্নান ও তানভীর তনয় হত্যাকান্ড। বাংলার তাগুত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী চিন্তাও করেনি এরকম হামলার বিষয়ে। এটি কতো বড় মাপের হামলা ছিলো তা হত্যাকান্ডের পর এ্যামেরিকান অফিশিয়াল'সদের দৌড়াদৌড়ি দেখে খুব সহজেই অনুমান করা গেছে।

এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ঘটা একটি ঘটনাও উল্লেখ করা যায়। গালফ ওয়ারে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের পর কুয়েতের মাটিতে খুব শক্তিশালী ডিফেন্স নিয়েছিলো। শোয়ার্জকফের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীও সেই ডিফেন্স বরাবর সৌদি আরবের মাটিতে অবস্থান নিলো। তারপর এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করলো যে সাদ্দাম বিশ্বাস করলো এটাক যদি হয়, তাহলে তা হবে পার্সিয়ান গালফ দিয়ে। উভয়মুখী হামলা ঠেকাতে আরো ইফোর্ট দিলো। কিন্তু ধূর্ত শোয়ার্জকফ কুয়েত থেকেও অনেক পশ্চিমে ইরাকের ভিতর দিয়ে ঢুকে আক্রমন করে সাদ্দামকে চমকে দিয়েছিলো। এই যুদ্ধে রিপাবলিকান গার্ডসহ সাদ্দাম হোসেন মাত্র ৪ দিনের মধ্যে গ্রেফতার হয়েছিলো।

শত্রুকে চাপের মুখে রাখা

শত্রুকে ক্রমাগত চাপের মুখে রাখতে হবে। শত্রুপক্ষের বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পারিক কোন্দল উস্কে দিয়ে বা শত্রুপক্ষের অপরাধ জনগনের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে বা শত্রুপক্ষের দুর্বল জায়গাগুলোতে আঘাত করার মাধ্যমে বা হঠাৎ করে নিজেরা সাময়িকভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়ার মাধ্যমে (যেন কোথাও নেই) এই চাপ সৃষ্টি করা যায়। এর বহুমুখী সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –

· মুজাহিদদের উপর আঘাত হানার চেয়ে শত্রুপক্ষ নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে বেশি ব্যস্ত থাকবে।

· মুজাহিদদের কাজের ক্ষেত্র, কাজের পরিধি এবং পরবর্তী পরিকল্পনা বুঝতে ব্যর্থ হবে।

· আক্রোশবসত অনেক ভূল কাজ করবে ও ভূল কথা বলবে যা জনমতকে বিষিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

· সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভূল করবে ইত্যাদি।

আলহামদুলিল্লাহ, কৌশলগত দিক থেকে আল-কায়দার মুজাহিদ ভাইয়েরা বাংলাদেশের তাগুত সরকারকে এখন পর্যন্ত যে চাপের মুখে রাখতে সক্ষম হয়েছে তার প্রমানস্বরুপ নিচে সামান্য একটি নথি পেশ করা হলো –

***

আল-কায়দাপন্থী জঙ্গী সংগঠন এখন ঝুঁকির কারণ

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/১৬১০৪৪৫

চলবে ইনশাআল্লাহ.....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০০০

উম্মাহর মুজাহিদিনদের ঘোষণা এটা উম্মাহর জিহাদ

Khalji-The-Seventeen

Member

০৯-১৬-২০১৯

"মাজাল্লাত উম্মাতা অয়াহিদা" সংখ্যা এক এর মুখবন্ধে আমাদের আমির আমাদের শায়েখ, শায়েখ আইমান আল জাওয়াহিরি (হাঃ)

উম্মাহর মুজাহিদিনদের যুদ্ধ হচ্ছে উম্মাহর জিহাদ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আমাদের প্রশংসনীয় নতুন ম্যাগাজিন (এক উম্মাহ) ম্যাগাজিনের জন্য কিছু বক্তব্য লিখে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। এটা আমার জন্য আমি সম্মানজনক হিসেবে গণ্য করি, এবং আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে আমি যেন এই দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে পারি। অতএব এই সংক্ষিপ্ত বার্তা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল উদ্ভুত হয়ে আশা করি আপনাদের অন্তরে পৌঁছে যাবে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, জিহাদ হচ্ছে লোকদের আল্লাহর দিকে আহবান এবং তার একত্ববাদের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার কয়েকটি পদ্ধতির একটি যাতে করে এই দুনিয়ায় কোন ধরনের গ্লানি থাকবেনা। আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেন, 'এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' আল্লাহ সুবহানা তাআলা আরও বলেন, 'আমি ইহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম নিষেধ করিবে; আর সকল কর্মের পরিনাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।' মুসলিমদের হুরমাত বা তাদের সম্মান, তাদের জান মাল রক্ষার জন্য এবং অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচার থেকে উত্তরণ করার জন্য জিহাদ নির্ধারিত হয়েছে। গৌরবান্বিত মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কি হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ-যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদেরকে অন্যত্র লইয়া যাও; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট

হইতে কাওকে আমাদের সহায় কর। যাহারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতারাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।' মুজাহিদ বাহিনী অবশ্যই এই পবিত্র আদেশগুলো দ্বারা মান্য করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা অবশ্যই তাদের মত পরিণত হবে না যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যাহা করনা তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা করনা তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। মূলত আল্লাহ তো তাহাদেরকে ভালবাসেন যাহারা আল্লাহর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত।' জিহাদের ক্রমবর্ধমান জোয়ার মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বকে গ্রহন করতে অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এটা একটা অপরিসীম রহমত যেটা শতাব্দী কাল ধরে মুসলিম দুনিয়া দেখতে পায়নি। আমরা এই রহমত নষ্ট করে ফেলবো না আমাদের গুনাহ এবং ভুলত্রুটির কারণে; বরং, আমরা অবশ্যই, আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাব, আল্লাহর রহমতের শোকর আদায় করবো, আমাদের কথার মাধ্যমে, আমাদের কাজের মাধ্যমে এবং আন্তরিকভাবে। আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেন, 'লড়াই কর কৃতজ্ঞতার সাথে ও' দাউদের সন্তানেরা, এবং আমার বান্দার কম সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ '। সবচেয়ে উত্তম পন্থায় আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারি এই রহমতের জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের কাজে এবং কথায় উম্মাহ আসলেই আন্তরিকতা দেখতে পাচ্ছে। অতএব আমরা যখন উম্মাহকে শুরার নীতির দিকে আহবান করি, চলুন প্রথমে আমরা শুরার নীতিগুলো আমাদের মাঝে বাস্তবায়ন করা শুরু করি। যখন আমরা উম্মাহকে শরীয়ত প্রণয়নের দিকে আহবান করি, আমরা যাতে আমাদের নিজস্ব সমস্যাগুলো শরীয়ত সম্মত করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করি। যদি আমরা দাবি করি মুসলিমদের হুরমাত বা তাদের সম্মান, তাদের জান মাল রক্ষার জন্য, তাহলে আমাদেরকে মুসলিমদের এই হুরমাতগুলোকে লঙ্ঘন না করার ক্ষেত্রে অথবা মুসলিম ভাই এবং মুজাহিদ ভাইদের উপর আঘাত করা বা হামলা না করার ক্ষেত্রে আমাদের পরিস্কার থাকতে হবে। যদি আমরা ঐক্যের দিকে আহবান করি, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদেরই আমীরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করি। যদি আমরা শোনা এবং মানার দিকে আহবান করি, তাহলে প্রথমে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে সেটা প্রনয়ন করার উদাহরণ পেশ করি। যদি আমরা আনুগত্য এবং শপথ পরিপূর্ণ করার দিকে

আহবান করি, আমরা নিজেরা সেটা ভঙ্গ না করি। যদি আমরা সৎকর্মের নির্দেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধের দিকে আহবান করি, তাহলে এই নীতিগুলো আমাদের নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা শুরু করি। আমরা কি সেই সাহসের অধিকারী হয়েছি, যে সাহসের অধিকারী ছিলেন শায়েখ, ইমাম, সংস্কারক শায়েখ ওসামা বিন লাদেন, যখন তিনি শায়েখ আতিয়াকে উদ্দেশ্য করে এই বাক্যগুলো বলেছিলেনঃ

'এখানে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরী একটা জটিল সমস্যার দিকেঃ মুজাহিদিনদের প্রতি উম্মাহর সহানুভূতির উপর প্রভাবকে যথাযথ গ্রাহ্য না করে নির্দিষ্ট অপারেশানগুলো পরিচালনা না করা। আমরা হয়ত এই নির্দিষ্ট লড়াইগুলোতে বিজয় লাভ করতে পারব এটা করার ফলে, কিন্তু আমরা যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে হেরে যাব। এই প্রয়োজনীয়তা সতর্কতার বিবেচনা করা এবং কোন অপারেশান পরিচালনার পূর্বে এর সুবিধা-অসুবিধার তুলনা করা... আমার ইচ্ছা একটা বার্তা প্রকাশ করার যেখানে আমি প্রস্তাব পেশ করতে ইচ্ছুক যে আমাদের একটা নতুন পরিকল্পনার সহিত শুরু করা কিছু ভুলের সংশোধনের যেগুলো আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এমনি করে, ইনশাআল্লাহ, আমাদের একটা বিশাল অংশের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে হবে যেটা মুজাহিদিনদের থেকে যে পরিমান আস্থা হারিয়ে গিয়েছিল এবং এইভাবে মুজাহিদিন এবং উম্মাহর মাঝে শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।' অতএব আমরা কি এই সাহসের অধিকারী হয়েছি যেটা আমাদের দ্বারা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে উম্মাহ সেটাকে অনুকরণ করবে, এবং এই বিশ্বাসের এবং সাপোর্টের নিশ্চিত করা ? আমাদের শেষ প্রার্থনা হচ্ছে যে সকল প্রশংসা সারা জাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এবং শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর উপর এবং শান্তি বর্ষিত হোক উনার সাহাবীদের (রাঃ) উপর।

আপনাদের ভাই, আইমান আল জাওয়াহিরি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২০৪

সংশয়ঃ ইলম শিক্ষাকালীন অন্য কোন ফিকির করা কি ক্ষতিকর?

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

০৮-০২-২০১৯

আলেম ও তালেবুল ইলমদের মধ্যে একটা বিষয় ব্যপক ভাবে প্রচারিত হয়। মাদ্রাসা পড়াকালীন ভিন্ন কোন ফিকিরের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না, কোন দ্বীনি জামাতের সাথেও যুক্ত হওয়া যাবে। এখানে কোন পার্থক্য ছাড়াই সবকিছুকেই তারা উদ্দেশ্য করে থাকেন। আর বলা হয় যদি কেহ এমন কাজ করে তাহলে ভাল আলেম হতে পারবে না, উম্মাহর জন্যে বড় কোন খেদমত করতে পারবে না। আসলেই কি তাই?

সাহাবারা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর জন্যে অনুসরনীয়, তারাই উম্মাহর মধ্যে ইসলামের মূল খেদমত করেছে। দ্বীনের এমন কোন অংশ নেই যেখানে তারা পরিপূর্ন ভাবে ইসলামকে বাস্তবায়ন করেন নি। তাদের বুঝ, তাদের ফিকির ও তাদের আমল হচ্ছে পূর্ন সঠিক ও বাস্তবসম্মত। এই জন্যে সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে আমাদের জন্যে মাপকাঠি বানানো হয়েছে। আমাদের কোন কাজ, ফিকির বা বুঝ তাদের মত হলেই সেটা সঠিক হবে। আর যে কোন কাজ, ফিকির বা আমল তাদের মত না হলে যত ভালই হোক, পরিত্যাজ্য। চাই তা যত বড় আলেম বা বুজুর্গ বলুক, কারণ সাহাবাদের পরে কাউকে দ্বীনের মাপকাঠি মানা গোমরাহি।

বিদায় হজ্জের সময় সাহাবাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। এত বিশাল পরিমান সাহাবাদের মধ্যে কতজন মুফতি ছিলেন যাদের কাছে মানুষ ফাতাওয়া জিজ্ঞাস করত? কয়জন মুহাদ্দিস ছিলেন? কয়জন মুফাসসির ছিলেন যারা পূরা কুরআনের তাফসির করত? আল্লাহর নবীর জীবদ্দশায় সাহাবাদের এমন হালত কি উনি জনতেন না? বড়রা তো আছেই,ছোট সাহাবীরা পর্যন্ত সার্বক্ষনিক ইলমের আহরনে লিপ্ত ছিলেন না। তা কি উনি বুঝতেন না? নাকি কাকতালীয় ভাবে হয়ে গেছে? অল্প বয়সের সব সাহাবীদেরকে অন্য সব ফিকির বাদ দিয়ে ইলমের মেহনতে লিপ্ত থাকতে বলেছেন, এমন কোন জায়ীফ হাদীসও কি আছে?

ধারাবাহিক ইলম চর্চা না থাকায় সব সাহাবী কি জাহেল ছিলেন? কক্ষনোই না। ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ

من كان مستنا فيلستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئك أصحاب محمد صلي الله عليه و سلم. كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه و لإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوا علي اثارهم و تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم و سيرتهم .فانعم كانوا علي الهدي المستقيم

এখানের সবগুলো বিষয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ন, তবে আমরা একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করব। সাহাবাদের ইলমের বর্ননা দিতে বলেছেনঃ তারা ছিলেন গভীর ইলমের অধিকারী। এটা বলেন নি যে, তারা অধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তারা অনেক বেশী ইলমের অধিকারী না হলেও সবাই দ্বীনের মৌলিক ইলম জানতেন। তারা সবাই বুঝতেন দ্বীনের জন্যে কি ধরনের কাজ করা দরকার, তারা জানতেন দ্বীন তাদের থেকে কি চায়। ফলে সমস্ত সাহাবী দ্বীনের সেই খেদমতেই জান-মাল সব বিলীন করে দিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে ইলমের মূল উদ্দেশ্য। ইলমের উদ্দেশ্য এটা নয় যে শতশত পৃষ্ঠার কাল হরফ মুখস্ত করে রাখবে, কিন্তু বুঝবে না দ্বীন তার থেকে কি ধরনের খেদমত চায় বা দ্বীনের জন্যে এখন কি করনীয়। ফলে এদের দ্বারা দ্বীনের লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।

আলেমরা হচ্ছেন নবীর উত্তরাধিকারি। কোন ছেলে তার বাবার সম্পদের উত্তরাধিকার তখনই হবে যখন তা সঠিকরূপে ব্যবহার করবে। যদি শুধু তার নামে লিখে দেয়া থাকে কিন্তু সে তা ব্যবহার না করে নষ্ট করে, তাহলে সে সঠিক উত্তরাধিকারী নয়। ঠিক তেমনি কোন আলেম যদি নবী আলাইহিস সালামের ইলমের সঠিক ব্যবহার না করে, নবীর কাজগুলোকে আঞ্জাম না দেয় তাহলে সে সঠিক উত্তরাধিকারী নয়। নবীর কাজ সম্পর্কে কুরআনে বর্নিত হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ – سورة جمعة 2

যে জাতি গোমরাহিতে লিপ্ত ছিল তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা নবী প্রেরন করেছেন চারটি কাজ দিয়ে। অর্থাৎ এই চারটি কাজের মাধ্যমেই সর্ব যুগের গোমরাহ সমাজকে ঠিক করা হবে। আর এই চারটি কাজ সঠিক ভাবে না হলে ভাল সমাজও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সে চারটি কাজ হলঃ ১/ কুরআন তেলাওয়াত করা ২/ তাজকিয়া করা ৩/ কিতাব শিক্ষা দেয়া ৪/ হিকমাহ শিক্ষা দেয়া। নবী আলাইহিস সালাম তো পূর্নভাবে সমাজে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। এখন আমরা দেখব আমাদের সমাজে যাদের বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারা তা করছে কিনা? যদি না করে তাহলে কি ক্ষতি হচ্ছে।

নবীর ওয়ারেস হিসেবে আবশ্যকীয় ভাবেই এই কাজ যাদের ঘাড়ে এসে বর্তায় তারা হচ্ছেন উলামায়ে কেরাম। আর যেহেতু নবী সা. এর কাজগুলো পূরা উম্মাহর জন্যে ছিল তাই উলামাদেরকেও সমস্ত মানুষের উপর তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা আবশ্যক। আসুন আমরা বর্তমানে মানুষের কাছে তাজকিয়া ও ইলম-হিকমাহ পৌছে দেয়ার মূল মাধ্যমগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করি, সঠিকভাবে তা আদায় হচ্ছে কিনা?

ওয়াজ-নসিহাতঃ এটা হচ্ছে মানুষের কাছে ইলম ও হিকমাহ পৌছে দেয়ার মৌলিক একটা মাধ্যম। এই ক্ষেত্রে এমন পর্যাপ্ত পরিমান আলেম দরকার যারা হবে মুত্তাকি, মুহাক্কিক ও পূর্ন দ্বীনের অনুসারী। যারা দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করে ইখলাসের সাথে মানুষকে ইলম-হিকমাহ শিক্ষা দিবে। আর এটা তৈরি দায়িত্ব মাদ্রাসার, তারা সেখানে মুত্তাকী ও মুহাক্কিক ছাত্রদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি কিভাবে সমাজের মানুষকে উত্তম ভাবে ওয়াজ-নসিহাতের মাধ্যমে ইলম শিক্ষা দিবে ও নিজেদেরকে সম্পদ ও সম্মানের আকর্ষন থেকে মুক্ত রাখবে তা শিক্ষা দেয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু উস্তাদরা যখন বলছেন, পড়া ছাড়া অন্য ফিকির থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে, তখন ভাল ছেলেগুলো ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু অযোগ্য ছাত্রগুলো ঠিকই এদিকে এগিয়ে আসছে। ফলাফল আমরা দেখছি বর্তমানে অধিকাংশ বক্তা অযোগ্য ও সম্পদ-সম্মানের লোভে পূর্ন। ফলে সমাজের মানুষ সঠিক ইলম-হিকমাহ না পেয়ে গোমরাহিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। সমাজ ধ্বংসের এই দায়ভার কার?

দাওয়াত-তাবলীগঃ যদিও বর্তমান এই মেহনতের ব্যক্তিদের মাঝে সমস্যা আছে, কিন্তু এদের মূল কাজটা ত্বাগুতী সমাজে মানুষের কাছে ইলম-হিকমাহ পৌছে

দেয়ার সুন্দর একটা মাধ্যম। দলবেঁধে বিভিন্ন মাসজিদে যাবে এবং সমাজের মানুষকে মাসজিদে এনে তা'লীমের মাধ্যমে সঠিক ইলম শিক্ষা দিবে। যারা আরো বেশি সময় দিতে চায় তাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে। এটা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে মানুষকে ইলম-হিকমাহ শিক্ষা দেয়ার চমৎকার একটা মাধ্যম হতে পারত।

এই জন্যে উলামাদের করনীয় ছিল তাদের মুহাক্কিক ছাত্রদেরকে এই কাজটা সুন্দর ভাবে শিখাবে। কিভাবে মানুষকে ইলম শিখাবে ও পরিচালনা করবে। ফলে তারা তাবলীগ জামাতে গিয়ে শরিয়াহর আলোকে ভাল-মন্দ যাচাই করে পূরা সিস্টেমকে ঢেলে সাজাবে অন্যথায় তারা নিজেরাই নতুন একটা সিস্টেম চালু করবে। কিন্তু এখন অযোগ্যতার কারণে না পারছে নিজেরা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কাছে এই সিস্টেমে ইলম পৌছাতে, না পারছে আগের সিস্টেমটাকে মডিফাই করতে। ফলে উম্মাহকে ইলম-হিকমাহ পৌছানোর বিশাল একটা সিস্টেম জাহেলদের হাতে চলে গেছে। সমাজকে এইভাবে আরো গোমরাহির দিকে পাঠানোর দায়ভার কার?

তা'লিমঃ ইসলামের শুরু থেকেই মানুষকে তা'লিম দেয়ার ভিবিন্ন পদ্ধতি চলে আসছে। সালাফদের সময়ে এমন কিছু পদ্ধতি ছিল যেখানে আমভাবে মানুষ ইলম অর্জন করতে পারবে, সেটা মাজলিস হোক বা অন্য কোন সিস্টেম। কিন্তু আমাদের তা'লিমের মাজলিসগুলো অল্প কয়েকজন ছাত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। না আছে সেখানে আমভাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ আর না মানুষের কাছে গিয়ে তা'লিম করা হচ্ছে। ফলে ব্যপকভাবে মানুষ জাহেল থেকে যাচ্ছে, সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে এইভাবে গোমরাহির দিকে ঠেলে দেয়ার দায়ভার কার?

লেখালিখিঃ তাসনিফের কাজ ইসলামের শুরু যুগ থেকেই ছিল উম্মাহকে ইলম-হিকমাহ পৌছানোর গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। এখন যদিও কিছু তাসনিফের কাজ হচ্ছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। আর যারা ভাল আলেম তারা এই কাজ দক্ষ নয়। কারণ তাদেরকে তাসনিফের কাজ শিখানো হয় নি বরং বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। ফলে এই অঙ্গনেও আগাছা দিয়ে ভরে যাচ্ছে, যারা বাহ্যিক ভাবে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হলেও ইসলামের বুঝ ও পালন থেকে অনেক দূরে। ফলে মানুষের কাছে পূর্ন ভাবে ইলম পৌছাচ্ছে না, মানুষ আরো গোমরাহির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাজকিয়াঃ আমাদের আমলের দুইটা দিক রয়েছে। একটা হচ্ছে ক্বলবের আমল, আরেকটা হচ্ছে অংগ-প্রত্যঙ্গের আমল।। ক্বলব হচ্ছে ইমান-কুফুর সহ সমস্ত ভাল-খারাপের উৎস। ক্বলব ভাল হলে সব ভাল, ক্বলব খারাপ হলে সব খারাপ। তাকজিয়া হচ্ছে, ক্বলবের সমস্যা অর্থাৎ কুফুর, নিফাক, কিবর, দুনিয়ার লোভ, রিয়া ইত্যাদি গুলোকে দূর করা। সেখানে ভাল আমল অর্থাৎ ইমান, ইয়াকীন, তাওয়াক্কুল, রিজ্বা বিল কাজা, তাকওয়া, মাহাব্বাতুল্লাহ ইত্যাদিকে শুরু করে দেয়া। এই তাজকিয়ার কাজ কিভাবে করতে হবে তা কুরআন, সুন্নাহ ও সিরাতে স্পষ্ট ভাবে বর্ননা করা আছে। যার ইলম শিক্ষা করা ও আমলে বাস্তবায়ন করা ফরজে আইন।

এই ক্ষেত্রে আমাদের এতটাই গাফেল, অধিকাংশ ব্যক্তি জানেই না এমন কিছু ফরজ ইলম ও আমল রয়েছে। ফলে যারা অগ্রসর হচ্ছে তারা প্রচলিত ভুল পদ্ধতির দিকে যাচ্ছে যার সাথে শরিয়ার কিছু সম্পর্ক রয়েছে। ফলে মানুষকে তাজকিয়া করানো তো পরের ব্যপার, উলামাদের মাজলিসে-মাহফিলে পর্যন্ত তাজকিয়ার নামে অনেক সময় কুফুরী-শিরকী কথা বলা হচ্ছে যার থেকে আমরা বেখবর। উম্মাহর এই অধপতনের দায়ভার কার?

এগুলো তো হল সমাজের মানুষকে ইলম-হিকমাহ ও তাজকিয়া শিখানোর ব্যপার। এখন আমরা নিজেদের "অন্য সব ফিকির বাদ দিয়ে ইলমের মেহনত" থেকে কতটুকু ফায়দা হচ্ছে তাই একটু যাচাই করছি।

প্রত্যেক মুসলিমের মাঝেই যে বিষয় গুলো থাকতে হবে, আল্লাহ-রাসূলকে নিজের জীবনের সব কিছু থেকে মহাব্বত করা, দ্বীনের জন্যে নিজের সবকিছুকে কুরবানী করার মানসিকতা, দুনিয়ার লোভ ও মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত থাকা, কুরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরা, হক জামাতকে আকড়ে ধরা, নিজের মধ্যে উম্মাহর ফিকির লালন করা, জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়। এগুলো আমাদের মাদ্রাসা থেকে শিখানো হয়? ফলে আমাদের অবস্থা কতটা খারাপের দিকে গেছে চিন্তা করতে পারেন?

কয়জন আছে যারা স্ত্রী-পরিজন বা দুনিয়ার জন্যে দ্বীনকে ত্যাগ করছে না? ব্যপকভাবে কুরান-সুন্নাহের বিপরীত কথাকে আকাবিরের নামে গ্রহন করা হচ্ছে,

হক জামাত তালাশ করবে তো দূরের কথা যে যেভাবে পারছে বিরোধীতা করছে। এই ভাবে আমরা নিজেরা যে গোমরাহির দিকে যাচ্ছি তার দায়ভার কার?

উপরের সবকিছু বাদ দিলাম, একজন মুমিন ঈমানদার হওয়ার জন্যের যে তাওহীদ জানা-বুঝা প্রয়োজন তা কি হচ্ছে? যারা কুফুরী গনতন্ত্র করবে বা সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে সবাই একই অপরাধী। এখন উলামাদের মধ্যে ব্যপকভাবে এই মহামারী ছড়িয়ে পরেছে। অন্যদিকে হাসিনা শুধু ত্বাগুত নয় বরং শাতেমে রাসূলদের গডমাদার, তার সাথে যে কোন ধরনের সম্পর্ক ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। কয়জন জানে এই বিষয় বা কয়জন বিরত থাকছে? এমন আরো অনেক কুফুরী-শিরকী বিষয়ে আমরা লিপ্ত হচ্ছি তার দায়ভার কার উপরে বর্তাবে?

সার্বিক ভাবে আমরা মুসলিম হিসেবে ইসলামে কয়টা বিষয় মানছি? ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে আমরা ইসলামের হুকুম ফলো করার প্রয়োজন মনে করছি? সারা দিনে অসংখ্য কাজ করছি নিজের বুঝে, যার ইসলাম বহির্ভূত। কয়টা বিষয়ে আমরা জানতে পারছি? প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়ে কাউকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দেয়া, ফরজে কিফায়া ইলমের জন্যে মারা, দান-জাকাতের টাকার যতেচ্ছা ব্যবহার বা নিজেদের সম্পদ, সময় ও শ্রমকে মনমত ব্যবহার ইত্যাদি শত শত বিষয়ের সাথে আছে কি ইসলামের কোন সম্পর্ক?

তাহলে সব ফিকির বাদ দিয়ে সারা দিন ইলম আহরনের লিপ্ত থেকে নিজেদের, উম্মাহর বা দ্বীনের কতটুকু ফায়দা হচ্ছে? ইহার পক্ষে যতই যুক্তি দেয়া হোক, সমাজের এই ধংসের কোন উত্তর কি দেয়া যাবে আল্লাহর কাছে?

ভিন্ন দিকে যে ব্যক্তিরা উম্মাহকে ঈমান-তাওহীদ শিখাচ্ছে,ইবাদুস সালিহিনের গুনাবলী শিখাচ্ছে, ফরজ ইলম ও আমল শিখাচ্ছে, সাহাবাদের মানহাজে দ্বীনের খেদমত করা শিখাচ্ছে, মানুষের কাছে ইলম-হিকমাহ পৌছে দেয়ার পদ্ধতি গুরুত্বের সাথে শিখাচ্ছে, নিজেরা কিভাবে সঠিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে অন্যদেরকে তাজকিয়াহ করাবে তা কুরআন-সুন্নাহ থেকে শিখাচ্ছে। তাদেরকে ব্যপারে ছাত্রদের মাঝে সন্দেহ ঢুকান হচ্ছে, বাধা দেয়া হচ্ছে, বিরোধীতা করা হচ্ছে।আল্লাহর কাছে যখন তারা নালিশ দিবে, পারবে কেহ কোন জবাব দিতে?

হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে পূর্ন দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের পথে সঠিক ভাবে আমল করে যাওয়ার তাওফীক দান করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৪৯

*****